বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী।

STATE CENTRAL LIBRARY
Calcutta

বিহার সাহিত্য ভবন লিঃ
৫, ডফ্ লেন, কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ—আষাঢ়, ১৩৫৫

প্রকাশক :

শ্রীশক্তিকুমার ভাদুড়ী

৫, ডফ্ লেন, কলিকাতা।

মুদ্রণ—

এইচ, বি, প্রিন্টিং ওয়ার্কস্—১০৯, আপার সারকুলার রোড।

প্রচ্ছদপট—

খালেক চৌধুরী।

ব্লক—

রিপ্রোডাকসন্ সিণ্ডিকেট্।

৭।১, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট্।

বাঁধাই—

বাসন্তী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্

৬১।১, মির্জাপুর স্ট্রীট।

দাম—৩৲

'মা' র শ্রীচরণে—

—শ্রীজ্যোতির্ময়ী দেবী।

বনেদী ঘরের ছেলে। সেকেলে বংশ, মধ্যকালের সমৃদ্ধি, একালের শিক্ষা তিনের সংমিশ্রণে তারা বনেদী শব্দটাকে অতিক্রম করে যেতে চায়। তাই কথায় কথায় এরিস্টোক্র্যাসী অথবা অভিজাত কথাটাই ব্যবহার করে। ছেলেরাই বেশী করে। বুড়ো কর্ত্তারা খেটে-খুটে রোজগার করেছেন, তাঁদের ছেলেরা স্বদেশেই বিদ্যালাভ করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে পিতৃ-মহিমায় বড় বড় কাজ পেয়েছেন; তাদের ছেলেরা বিদেশে গেছে, বিলেতে গেছে, বিপথেও গেছে কেউ বা। এক কথায় তারা প্রকৃতই অভিজাত হয়ে উঠেছে—বেপরোয়া লক্ষণে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় আভিজাত্যের কোনো লিখিত ধারা তো নেই। যদি কোনো লেখা, নিয়মাবলী থাক্ত তার পরিমাণ নির্ণয়ের, নিখুঁত বিলিতী চালে থাকাতেই বা কতটা আভিজাত্য কিংবা একান্ত খদ্দরেই বা কতটা অথবা সেকেলে বনেদীয়ানাতেই বা কতটা অভিজাত হওয়া যেতে পারে এবং বহির্বাস নয়, আবাস আসবাব প্রতিবেশ অর্থাৎ বালিগঞ্জের কাষ্ঠময় অত্যাধুনিক সভ্যতায়, ভবানীপুরের পুরানো, বালি-গঞ্জের নির্লিপ্ত দূরত্বময় দেশী-বিদেশী মিশ্র সভ্যসমাজের আর

খাস কলকাতার সেকেলে সদর, অন্তঃপুর, তাম্বুল-তামাক জরী-জড়োয়া রৌপ্য-স্বর্ণময় বনেদীয়ানারই বা কতটা অভিজাত মূল্য, তা হলে হয়ত তর্ক আলোচনার একটা শেষ ওরা খুঁজে পেত।

নীতিশের বন্ধু প্রতুল চক্রবর্ত্তী বলে, 'অভিজাত বলতে যা বোঝায় তার জন্য চার পুরুষ অপেক্ষা করা চাই। তুই হয়তো বুঝলেও বুঝতে পারিস, আমার বোঝা হবে না। কেননা আমার বাবা গরীব গেরস্থ মাত্র, আমার পৌত্র হয়ত বুঝলেও বুঝত যদি আমি বড়লোক হই।'

নীতিশ বল্লে, 'অর্থাৎ?'

প্রতুল বল্লে, 'অর্থাৎ প্রথম পুরুষে তোর ঠাকুদার বাবা হরিশ চাটুয্যে ছিলেন যাকে বলে শ্রমিক। চাষ-বাস দেখতেন, ঘণ্টা নেড়ে পূজো করতেন, চাল কলাতেই যথেষ্ট তুষ্ট হতেন। নিতান্তই গল্পের দরিদ্র ব্রাহ্মণ, যাঁদের অনায়াসে রাজসভায় ভিক্ষে করতে পাঠানো চলত। দ্বিতীয় পুরুষে তোর ঠাকুদা কলকাতায় এসে পড়লেন। তখনকার দিনে লেখাপড়া শেখাটা এখনকার মত এমনি 'অনর্থকর' নিষ্ফলা ছিল না অর্থাৎ তাতে সদ্য ফললাভ হত। তিনি সরকারী বড় কাজ পেলেন, বিস্তর টাকা উপার্জ্জন করলেন, জমালেন, কিন্তু খরচ করলেন না বিশেষ। এই হচ্ছে তোদের বংশের বৈশ্য যুগ। তারপর তিন পুরুষে তোর বাবা থেকে হল আভি-জাত্যের আরম্ভ অর্থাৎ খাঁটি রাজসিকতার, ক্ষত্রিয় আর কি!

তিনি সেই সঞ্চয় দু'হাতে ব্যয় করলেন নিজের জন্য, পরের জন্য, খেয়ালের জন্য, খুসীর জন্য। পৃথিবীকে অবজ্ঞা করলেন মানুষকে আরও বেশী। এক কথায় অভিজাতের কিছু কিছু দুর্লক্ষণ লোকে যাতে মুগ্ধ হয় তা তাঁর ছিল।'

প্রতুল হাসলে, বল্লে, 'ঠিক তো, দেখ ?'

নীতিশও হাসলে, বল্লে, 'তা হলে তোর মতে আমি ওর ব্রহ্মণ্য সীমায় পৌঁছেচি।'

প্রতুল বল্লে, অনেকটা। কিন্তু জ্ঞানী আর ভিখিরী এক সঙ্গে হলে। না হলে আর ব্রহ্মণ্য কোথা।'

তারপরের কথা থাক্। আগে নীতিশের বংশ পরিচয় দিই।

তখনকার আধুনিক বয়স দরিদ্র ব্রাহ্মণের ছেলে নীতিশের ঠাকুদা দুর্গাদাসবাবু যখন কলকাতায় আসেন, কলকাতায় তখন পাল্‌কী-ছ্যাকড়া গাড়ী ছাড়া যানবাহন ছিল না, ঘোড়ার ট্রামগাড়ী উপক্রমণিকায়। পশ্চিমের অনেক সহরের মত খোলা নর্দমা, তার জন্য প্রচুর মাছি মশা, ততই দুর্গন্ধ, অপরিচ্ছন্ন গলি, অপরিসর অন্ধকার পথ মোহহীন, উৎসবহীন, সমারোহ শ্রীহীন সহর তখনকার বারমাসে তের পার্ব্বণের পল্লীগ্রামের ছেলের চোখে মোহের অঞ্জন লাগায়নি।

কিন্তু মনে পরিবর্ত্তন এনেছিল। তখন ব্রাহ্ম সমাজের নবযুগ। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের, কেশব সেনের প্রভাব সমাজের

ওপর পড়েছে। তিনি হিন্দু কলেজে পড়লেন, হেয়ার সাহেবের স্নেহ ও ডিরোজিওর প্রভাবে বড় হওয়া ছাত্রদের কথা গল্প শুনলেন। রামমোহন রায়ের শাস্ত্র-বিচার পড়লেন। রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল একাল' বক্তৃতা শুনলেন। আদি সমাজের উপাসনা ও গান শুনলেন, কেশব সেনের বক্তৃতা শুনলেন। মনে কিছুটা ভাঙন ধরল। অর্থাৎ না রইলেন পুরোহিত হিন্দু, না হলেন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম। ভরসার অভাবেই হোক বা প্রেরণার অভাবেই হোক ব্রাহ্ম হলেন না। ফলে আচার রইল হিন্দুর, উপাসনা হ'ল ব্রাহ্মের মত।

প্রতুলের হিসাবে তিনি শ্রমিক বা শূদ্র যুগ থেকে বৈশ্য যুগের সৃষ্টি করেছিলেন বটে ওদের পরিবারে। কিন্তু মনে মনে সত্য জাত তাঁর বৈশ্য ছিল না।

একদিকে আত্মবিস্মৃত, বিজাতি-সভ্যতা-সাহিত্য-মুগ্ধ বীর কবি মধুসূদনের, অন্য দিকে জাতির মন্ত্রদ্রষ্টা নব ব্রাহ্মণ রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম-ভূদেবের আবির্ভাব সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মের নব জন্মোৎসবের উচ্ছ্বসিত সমারোহে সমস্ত বাঙলা দেশের শান্ত বাল্যকালে যেন অকস্মাৎ নবজাগরিত বিস্ময়ানন্দে অভিভূত কিশোরকাল এসে উপস্থিত হল। সেই মহামানবদের কম্প মন্দাকিনীর ত্রিবেণী ধারায় সেদিনের তরুণ সম্প্রদায় যেন তাদের অন্তরের আনন্দপ্রবাহিনীর গতি খুঁজে পেয়েছিল। শিশুবোধ শুভঙ্করী পড়া পল্লীগ্রামের সেদিনের কিশোর বালক দুর্গাদাসের চোখেও নূতন মানসিকতায় অপূর্ব্ব

গৌরবময়, পরম ঐশ্বর্য্যশালী এক 'আনন্দময় ভুবন' জেগে উঠল যার পুরাতন কোনো ইতিহাস ছিল না, ধারা প্রবাহ ছিল না।

দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পরে বিংশ শতাব্দীর প্রথমে পিতামহের সমৃদ্ধ প্রাচুর্য্যময় অট্টালিকার স্বচ্ছন্দ কোলে জন্মগ্রহণ করে তার সন্ধান নীতিশরা পেয়েছিল কি না বলা যায় না।

নীতিশ ছিল তাঁর ছোট ছেলের একমাত্র সন্তান। নীতিশের পিতা নরেশের উপরে তাঁর আরও তিনজন ছেলে ছিলেন, কয়েকটি মেয়েও ছিল। বহুজনের কোলাহলে, বহু চিত্তের আনন্দের চিন্তার উচ্ছ্বাসের কল্পনার আদানপ্রদানে,—আর বহু মনের গ্লানি দৈন্যে সংকীর্ণতায় সে সংসারের প্রতিদিনের রথযাত্রা মুখরিত ছিল।

মা নীতিশের শৈশবেই গত হয়েছিলেন। পিতা ছিলেন কিছুদিন কিন্তু তাঁরও বাল্যকালেই মৃত্যু হয়। বাড়ীতে পিতামহ-পিতামহী, তিন জ্যেঠা-জ্যেঠিমা আর বহু সম্পর্কীয় ভাই বোনের মাঝে পরিজনদের সতর্ক প্রশ্রয় আদর আর অসতর্ক উপেক্ষা ছিল নীতিশের নিত্য ও নৈমিত্তিক পাওনা। শাশুড়ীর প্রসাদ লাভেচ্ছুক বধূরা দেবর পুত্রকে প্রতিযোগিতা করে যত্ন করবার চেষ্টাও যেমন করতেন, শাশুড়ীর চোখের আড়ালে বিপুল উপেক্ষায় অন্যমন হতেও তাঁদের দেরী লাগত না।

একান্নবর্ত্তী সচ্ছল পরিবারের আভিজাত্যের প্রসাদ নীতিশ আর সব ভাই বোনের মতই পেত, যদিও জ্যেঠা-

মশায়ের সাদা ঘোড়ার জুড়ী গাড়ীতে উঠে পাশের দিকে বসবার অধিকার তার ছিল না। মেজ জ্যেঠার মোটরে উঠে কিছুতে হাত দিলে ড্রাইভারের কাছেও খেয়েছে তিক্ত ধমক। অন্য ভাই বোনদের যেখানে কিছুই শাসন হয়নি। তবু সে বাড়ীতেও প্রচুর দুষ্টুমি করেছে, গাড়ীতেও দাঁড়িয়ে থেকেই পথের নানা দ্রষ্টব্যতে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে—যেন কিছুই মনে লাগেনি। ভিতরে ভিতরে অপমান সইবার শক্তি যেন আভিজাত্যের গৌরবের সঙ্গে ওর ছিলই।

ওর বড় জ্যেঠা গিরীশ ছিলেন অবসর-প্রাপ্ত ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। মেজ জ্যেঠা হরিশ ছিলেন উকীল। সেজ পরেশ ছিলেন এটর্নী। ওর পিতা ছিলেন ডাক্তার এবং অল্প বয়সেই তাঁর মৃত্যু হয়।

সরকারী খেতাব চিহ্নিত চাকুরে গিরীশ ক্রমে বড়লোক হয়ে ওঠা বাপের ছেলেরা যেমন হয় তেমনি ছিলেন। তাঁর অহঙ্কৃত সৌজন্য, সুপরিমিত শিষ্টাচারের প্রসাদ সকলেই পেত কিন্তু তার সীমানার গণ্ডি অতিক্রম করে তাঁর মনের অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে কেহই সহজে পারত না। ভাইয়েরা সকলেই এবিষয়ে বড়কে অনুসরণ ও অনুকরণ করতেন। আসলে আভিজাত্যের যে একটা দিক নিজেকে দূরে রাখতে চায় সকলের থেকে, সেটা ওদের বাড়ীতে স্পষ্টভাবেই ছিল। সৌজন্য শিষ্টাচারের অন্তরালে যে প্রচ্ছন্ন একটা অহঙ্কার ও অবজ্ঞা তাঁদের থাকত সেটা তাঁদের সন্তানদের মাঝখানে

এতই পরিস্ফুট হয়ে দেখা দিল যে তাদের সহজ ব্যাবহারটাও ছিল অবজ্ঞাময়। মেয়ে তাঁদের বাড়ীতে একেবারে শাস্ত্র সংহিতার দুহিতা, অর্থাৎ একান্ত করুণার পাত্রী।

সেকেলে গ্রামের যে দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদারদের বনেদীয়ানাতে একমাত্র কর্ত্তাই সত্য আর সব মিথ্যা বা তিনিই মানুষ আর সকলে হেয় জন ভাব ছিল; এদের নতুন জাতকদের মধ্যে সেই ভাবটাই ফুটে উঠেছিল। কিন্তু ব্যক্তিতন্ত্রে নয়, বংশ বা দলতন্ত্রে।

জ্যেঠিমারা ছিলেন খানিকটা সেকেলে অন্তঃপুরিকা। রান্নাঘর ভাঁড়ার ঘর শোবার ঘর ছাড়া তাঁদের আর অন্যত্র গতিবিধির অবসরও ছিল না, সখও ছিল না। তাঁদের সংসার যাত্রাটা ছিল এমনি একটা নিরবচ্ছিন্ন জিনিষ, যে, তার বাইরে ভিতরে আঙিনাটার ওপারে একটা বহিপ্রাঙ্গণ আছে, তারও ওপারে একটা বাইরের জগত আছে, যার সম্বন্ধে তাঁদের না ছিল কৌতুহল না ছিল প্রয়োজন। প্রয়োজনের দুনিয়াটা তাঁদের ঐ চার পাঁচটি কেন্দ্রেই নিবদ্ধ। ছেলে মেয়েরাও তার ওপারে গেলে তাদের নাগাল না পাওয়াটাই যেন তাঁরা অভ্যাস করে নেন। বাড়ীর পুরুষদের সম্বন্ধে তাঁদের ছিল প্রচুর প্রশ্রয়। আরামের বিরামের প্রয়োজনের এতটুকু ক্রটী তাদের সয় না, তাদের এই বিপুল স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁদেরই হাতে। আর ছিল পরম ভয়, পাছে এই আয়োজনে অনুষ্ঠানে ক্রটী ঘটে, তাঁরা বিরূপ হন।

ছেলেরাও ছিল তাঁদের 'ক্রোড়-দেবতা'। পূজার দেবতা ও মানুষের মাঝখানে যদি কোনো মহিমা ও মোহময় স্তর থাকে সেইখানে ছিল তাদের বাড়ীর পুরুষদের সিংহাসন।

নীতিশের বড় জ্যেঠিমা এবিষয়ে ছিলেন পুরা সেকেলে বধূ। আচার বিচার, রান্না ভাঁড়ার, লোক-লৌকিকতার আয়োজনে ও আড়ালে সারাটা দিন কি শীত কি আষাঢ়ান্ত বেলা কোথা দিয়ে চলে যেত। সেকেলে মেয়ের মতই সংযম সম্বরণ ছিল। অধিকারের ধার ধারতেন না, কিন্তু ভাঁড়ারের কর্ত্রীত্বের ভূমি সূচ্যগ্র কারুকে ছেড়ে দিতেন না। স্বামী তাঁর সংসারের দশজনের একজনের মত। স্বামীর জন্য তিনি সংসারের কাজের নেশা ছাড়তে পারতেন না, এমনি তাঁর ছিল কর্ত্তব্যের মোহ। নিজের একটু বড় ছেলেমেয়েরা চাকরের কাছে দাসীর কাছে স্নান করেছে, তৈলাক্ত গায়ে জামা পরেছে, তেল গড়ানো চুলে স্কুলে গেছে, কি মাস্টারের কাছে পড়তে বসেছে, খাওয়ার সময় পরিজনদলের সঙ্গে বসে খেয়েছে, যে যে দিন না খেয়েছে সেদিন জননী জেনেছেন সে অসুস্থ বা অনুপস্থিত। মোটের ওপর ঐ বিরাট সংসার যাত্রার মধ্যে জ্যেঠিমার সময় ছিল না একটুও। তাঁর ছেলে মেয়ে ছিল আটটি। বড় মেয়ে বিধবা হয়ে বাপের ঘরে ফিরে আসে নিজের দুটি সন্তান আর একটি পিতৃমাতৃহীন ননদ নিয়ে।

এই বড় দিদির ছেলে মেয়েরাই প্রায় নিতীশের সমবয়স্ক।
আর আর সব জ্যেঠিদের ছেলে মেয়েরাও তার চেয়ে বেশী ছোট নয়।

এই বিরাট পরিবারের আওতায় মুগ্ধ অথচ অচ্ছেদ্যভাবে বাঁধা যেন স্বপ্নাভিভূত জীবন যাত্রার কোলে নীতিশের যখন দশ বছর বয়স তার পিতামহের মৃত্যু হ'ল।

বালক নীতিশের মনে হ'ল, এটা যেন মৃত্যু নয়, কিসের একটা সমারোহ।

সহসা লোকজন আত্মীয়-কুটুম্বে বাড়ী ভরে গেল। বিরাট ক্রিয়ায় দানের ভোজের তালিকা হতে লাগল, এক পিতামহী ছাড়া সকলেই নানা কর্ম্মে কোলাহলে ব্যস্ত। আয়োজনে অনুষ্ঠানে আচারে নিয়মে নিরবসর দিনগুলি যেন ডানা মেলে দিক্‌দিগন্ত থেকে কাজ আহরণ করছে। সকল ঘরের বন্ধ দরজা জানালা খোলা, সকল আলমারী সিন্ধুকের অজানা কোণ থেকে সতরঞ্চি, জাজিম, গালিচা, আসন, বাসন, তৈজস, বহু জিনিষপত্র মুক্তি লাভ করেছে। চেনা অচেনা আহুত অনাহুত মানুষেরও যেন সীমা সংখ্যা পাওয়া যায় না। বৈঠকখানায় ফরাসের ওপর বালিস মাথায় দিয়ে তাকিয়া কোলে নিয়ে কত অজানা মানুষ নির্লিপ্তভাবে বসে শুয়ে আছে। অন্তঃপুরে সিল্ক মখমলে কাজ করা জামা কাপড় পরা ছেলের দল, ডুরে শাড়ী পরা ছোট ছোট মেয়েতে,

রঙীন কাপড় পরা বৌ-মেয়েতে, যাত্রার দলের নিকষা জননীর মত স্থবির শ্রীহীন বহু বিধবা বৃদ্ধা প্রৌঢ়াতে বাড়ী ভরে গেছে।

পরিচয় প্রণাম আশীর্ব্বাদও যেমন, হাসি, রহস্য শ্লেষ বিদ্রূপ তর্ক বিতর্ক কম ছিল না। যেন একটা প্রকাণ্ড গোলমেলে স্বপ্নের মত দিনগুলো উলটে পালটে একইভাবে ভোজ ও ভোজ্য আর লোকজন নিয়ে যাচ্ছে আর আসছে।

তারপর সহসা একদিন ঐ গতি-চক্র্ থেমে গেল।

সেদিন সন্ধ্যার পর পিতামহীর ঘরে শুতে এসে নীতিশের মনে হ'ল, বাড়ীর একটা অংশ যেন একেবারে খালি হয়ে গেছে।

সন্ধ্যার দিকে অবসর মত ছেলেরা জননীর কাছে এসে বসলেন।

চারিদিকে ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে হঠাৎ গিরীশ জননীকে বল্লেন, 'মা তুমি কি আর খাটে শোও না?'

জননীর মাটীতে একটা কম্বল পাতা বিছানা ছিল। মা বল্লেন, 'না বাবা, বড় গরম হয়।'

পিতার শ্বেত পাথরের টেবিল, দামী কাঠের পালঙ্ক, মূল্যবান ঘড়ি, এদিক ওদিক বহু জিনিষ গিরীশ ধীরে ধীরে পর্য্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। কিসে কিসে ধূলো পড়েছিল একটু কোঁচার কাপড়ে ঝেড়ে নিলেন।

আর ভাইয়েরা জননীর কাছে বসে নানা বিষয়ে কথা কইছিলেন।

রাত্রির আহারের আহ্বান এলো।

গিরীশ নেমে যাবার সময়ে বল্লেন, 'কাল তা হলে মা বাবার খাটটা আমি নিয়ে যাব ও ঘরে। আর তোমারটাতে 'নিতে' শোয় নাকি?'

জননী বল্লেন, 'হাঁ, নিতু আর নলিন ওটাতে শোয়।' নলিন রমার ছেলে।

'তা ওটা তবে থাক। আর এই ঘড়িটাও খারাপ হয়ে যাবে ঠিক সময়ে দম না পড়লে—ওটা বৈঠকখানা ঘরে পাঠাতে হবে।' জ্যেঠামশাইরা নেমেই গেলেন।

ঠাকুমার পাশে নিতু আর নলিন এতক্ষণ চুপ করে শুয়ে ছিল। এইবার তারা বিছানায় উঠে গিয়ে চুপি চুপি গল্প করতে লাগল। ঠাকুমা নীরবে কর জপ করতে লাগলেন। রমা দরজায় ঠেস দিয়ে চুপ করে বসে রইল।

বাড়ীতে তিনজন মাস্টার ছিলেন ছেলে মেয়েদের। এক শিশুগুলিকে খোঁয়াড়ে রাখবার জন্য ও একটু তার বড়দের বর্ণপরিচয় ও নামতা গলাধঃকরণ করে দেবার জন্য, আর একজন তারপরের একটু বড় যারা তাদের ক্লাস প্রমোশনের নম্বর পাইয়ে দেবার জন্য; এবং অন্যজনটি মেয়েদের, মেয়েলি মাত্রায় বিদ্যা শিক্ষা দেবার জন্য।

দুজন তার মধ্যে গৃহপালিত। বিলিতী সমাজের "ওয়ান্টেড স্থানী'দের বিজ্ঞাপনে যেমন দেখা যায়', আহার ও আশ্রয় এবং "অলফাউণ্ড" কিঞ্চিৎ দক্ষিণা সহ তেমনি এই

দু'জন মাস্টার মশাইও সব পেতেন ছাত্র অনুপাতে যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা-সহ। কেননা যতটা দরদস্তুর ও ব্যয় সঙ্কোচ করা যায়—মাস্টারদের দক্ষিণাতে, এমন আর কোনো প্রয়োজনে, বিলাসে ব্যসনে কোনো কিছুতেই চলে না।

ছোট 'অলফাউণ্ড' মাস্টার মশাই নানাবিধ বয়সের বাড়ীর যাবতীয় শিশু ও বালক বালিকাদের বর্ণপরিচয় ফার্স্ট বুক থেকে বোধোদয় অবধি পড়াতেন। এক কথায় সারা সকাল ও বিকাল নানাবিধ বয়সের ছাত্রগুলিকে নিয়ে একটি গোয়ালে বসতেন। তার মাঝখানের সময়টা ভদ্রলোক নিজের কলেজ ও পড়াশোনা করতেন।

কিন্তু প্রোমোশন পাইয়ে দেবার ননী মাস্টারমশাইয়ের সে অবসরটুকুও মিল্‌ত না। তিনি ছিলেন নীতিশদের কয়জন বড় ছেলেদের সর্ব্বক্ষণব্যাপী মাস্টার।

হঠাৎ কেমন করে নীতিশের মেজ জ্যেঠামশাই হরিশের মনে হয়ে গেল গুরুগৃহে বাস করলে বা ছেলেদের বোর্ডিংএ রাখলে বেশ নিয়ম অভ্যাস হয়, বাড়ীর মত 'খেয়ালখুসী চলে না। কিন্তু যখন গুরুগৃহ এখনকার দিনে নেই এবং বোর্ডিংয়ে থাকলে স্বাধীন মতামত গড়ে ওঠবার স্বার্থপর হবার সম্ভাবনা আছে—তাতে গুরুজনদের সকলের সমান মত নেই; তখন গুরুকেই গৃহে বাস করিয়ে খানিকটা গুরুগৃহ ধরণের ব্যাপার করে তোলার চেষ্টা করা হল। সুতরাং সর্বব্যাপী ঈশ্বরের মত এই সর্ব মুহূর্ত্তব্যাপী ননী মাস্টারমশাই সকালে ঘুম

ভাঙানো দাঁত মাজানো কাপড় বদলানো থেকে নিয়ে পড়ানো, বেড়ানো, খেলা শেখানো, সাপ্তাহিক নখকাটা ময়লা কাপড় ছাড়া সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করবার ভারগ্রস্ত হলেন।

ভদ্রলোক ছাত্র ভাল ছিলেন। এক সময়ে পড়াশোনার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, আশাও ছিল কিছু হবেন। কিন্তু মা দিলেন সকাল করে বিবাহ, আর বাপের হ'ল অকালমৃত্যু, কাজেই বি, এ, পড়ার মাঝেই এই সর্বশরণংদাতা চাকরী নিতে হল। কিন্তু গুরুগৃহে গুরুকর্ত্তা হতেন, তাঁর কেউ উপরওয়ালা থাকত না। পুরাকালে দেখা গেছে তিনি ছাত্রদের নিয়ে সমাদর অনাদর উপেক্ষা ইচ্ছামত করতে পারতেন। ননী মাস্টার মশাই তো তা হলেন না, উপরন্তু তাঁর উপর জননীর কর্ত্তব্য ভৃত্যের কর্ত্তব্যের দায়ও পড়েছিল। কাজেই গুরু গৃহে সর্বে-সর্বার সুখ তো হল নাই, নিজের পড়ার বা কোনো ব্যক্তিগত কাজের খেয়ালের অবসর লাভও তাঁর দুর্ঘট হয়ে তাঁর মেজাজ তিক্ত বিরক্ত হয়ে গেল। কোনোক্রমে ছাত্রদের পড়িয়ে প্রোমোশন পাইয়ে দিতে পারলেই তিনি তাদের বাপ জ্যেঠাদের হাত থেকে কর্ত্তব্যের দায় থেকে মুক্তি লাভ করতেন।

চারদিকে একটা বিরক্ত গাম্ভীর্য্যের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে তিনি নীতিশ নলিন প্রবীর মনীশদের পড়াতেন। যা জানতেন তার উত্তর দিতেন, যা জানতেন না তার উত্তরে ধমক দিতেন, অথবা টিট্‌কারী দিতেন, বিদ্রূপ করতেন, এই ছিল তাদের নকল গুরুগৃহের আবহাওয়া।

প্রবীর ছিল মেজকর্ত্তার আহ্লাদের ছেলে, প্রতিদিনের ঘটনা কেমন করে সে খাবার সময় বা কখনো মা বাপের কাছে পৌঁছে দিত। কে ভাল পড়ে, কাকে মাস্টার মশাই আজ বকলেন, ভাল বললেন কাকে, কাকে কি বললেন বিদ্রূপ করে, প্রবীরকে এই সব জন্য তাঁর ভাল লাগত না। মনীশ মন্দ নয়, সে বড়কর্ত্তার মেজ ছেলে। সে পড়াশোনার জন্য মোটেই উদ্‌গ্রীব নয়, কোনোদিন কোন বিষয়ে তাকে উদ্যোগী হতে দেখা যেতনা, না খেলাতে না পড়াতে না কিছুতে। খেয়ে ঘুমিয়ে বেড়িয়ে খেলা করে যে অবসর পাওয়া যেত সেটুকুও সে পুরা পড়াতে দিতে পারত না; তাকে প্রোমোশন পাইয়ে স্কুলের ক্লাশে তুলে দেওয়ার যত কিছু সাধনা ও সাধ্য সবই মাস্টার মশাইয়ের দায় ছিল।

রমার ছেলে নলিন চুপচাপ গম্ভীর প্রকৃতির, তার মাথায় ঢুকেছিল পড়তে তাকে হবেই, মানুষ হতে হবেই। প্রশ্রয় স্নেহ সমাদর সে কারুর কাছেই পেত না বরং বাড়ীশুদ্ধ গুরুজনের চাঁদা করা উপদেশ পেয়ে বড়দের ভয়ই করত। তার নিজের পড়া ও কাজ নিয়মিত ভাবে করে নিত। আর নীতিশ পিতামহীর আদুরে নাতি। বুদ্ধি ছিল এবং দুষ্টবুদ্ধিও ছিল। কিন্তু ঠাকুমার এত অবসর ছিল না তার কথা শোনার বা ভাবার, তিনি সময় মত আহার নিদ্রার ব্যবস্থা নিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন।

ননী মাস্টারমশাইয়ের প্রবীরের ওপর রাগ ছিল, কারণ যখন তখন মেজ কর্ত্তার কাছে নানা কৈফিয়ৎ তলব হ'ত

প্রবীরের কথা সূত্রে। আর মনীশের সম্বন্ধে ছিলেন নির্লিপ্ত।

রমার ছেলে তো 'ফাউ ছাত্র', কাজেই সে তাঁর কাছেও দয়ার পাত্র। এবং দেখতে পাওয়া যায় এক দয়ার পাত্র তার নীচের করুণাভাজনকে করুণা করে না, পারলে অপমানই করে। নলিনের ভাগ্যে ননীমাস্টারের সহায়তার চেয়ে অপমানই জুটত।

নীতিশকে তাঁর ভয় করবার দরকার হত না, কেননা তার কারু কাছে কোনো কথা বলবার অভ্যাস ছিল না। কখনো উদাসীন ভাবে তিনি চারটি ছাত্রকে, কখনো নিজের মেজাজ অথবা তাদের অভিভাবকের মেজাজ অনুযায়ী পড়াতেন।

দীর্ঘকাল পরে নলিন ও নীতিশের মনে হয়েছিল পারলে তিনি সেকালকার গুরু আয়োদধৌম্যের মত ছাত্রকে বনের পাতা-লতা খাইয়ে অন্ধ করে রেখে দিতে পারলে হয়ত সুখী হতেন।

পিতামহের মৃত্যুর কিছুকাল পরে জ্যেঠামশাইরা আবার হঠাৎ মত বদলে ফেললেন। ননী মাস্টার মশাই প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় মাস্টার মশাইয়ের পদে অবতারিত হলেন।

মেজ কর্তা বললেন, 'ও একটা খোঁয়াড়ে সব কটা বাছুর বেঁধে রাখার মত এতে কিছু লাভ হচ্ছে না। আমি প্রবীরের জন্য আলাদা মাস্টার রাখব। ওকে বিলেত পাঠাব, মানুষ করা চাই তো।'

বেশী বেশী মাহিনা দিয়ে ভালো ভালো মাস্টার অঙ্কের ও ইংরাজীর জন্য এলো। শুধু একলা প্রবীর পড়বে।

বড় কর্ত্তা গিরীশও হঠাৎ বুদ্ধিমান হয়ে গেলেন, তিনিও নিজের ছেলেদের জন্য মাস্টার নিযুক্ত করালেন একটু কম দামী। নলিনও চিরকালের মত মামাদের প্রসাদী পাঠ নিতে লাগল।

শুধু বন্ধ হয়ে গেল মাস্টার নীতিশের। অপ্রতিভভাবে বালক নীতিশ নলিনের সঙ্গে মনীশের ঘরে গিয়ে বসে। নতুন মাস্টার মশাইরা একজনের জায়গায় একসঙ্গে তিনজনকে দেখে বিরক্ত হন।

অতিশয় দীন মুখে ভিক্ষার্থীর মত এরা দু'জনে বসে থাকে, যদি একটুও সাহায্য পায় পড়ায়। মাস্টার অভ্যস্ত পাঠ কোন মতেই স্বকীয় পথ খুঁজে পায় না। কয়েক মাসের মধ্যেই প্রোমোশন হয়ে গেল স্কুলের। নলিন নীতিশ সোজা-সুজী পাশ করেছে, মনীশ মন্দ নয়। প্রবীর ভালো।

মনীশের পিতা গিরীশবাবু পড়ার ঘরে এসে বললেন "তোমরা এক ঘরে সবাই বসলে পড়া ভাল হয় না বলেই আমি আলাদা ব্যবস্থা করেছিলাম। তোমাদের আলাদা মাস্টারের ব্যবস্থা করব।"

আরক্তিম মুখে নীতিশ মাথা নীচু করে বসে রইল।

তারপর দিন থেকে নীতিশ পৃথক্ পড়তে বসত। নলিন সভয়ে মামার ঘরের একপাশে বসে থাকত।

দীর্ঘকাল পরে পিতামহী জানলেন নীতিশের মাস্টার নেই এবং তাঁর পুত্রেরা নিজ নিজ সন্তানের পৃথক ব্যবস্থা করেছেন। যেদিন নীতিশ ভাল করে ম্যাট্রিক পাশ করেছে খবর পেল সেইদিন ননী মাস্টার মশাই প্রবীরদের ওপর বহুদিনের হিংস্র বিরাগকে খানিকটা চাপা দিয়ে নীতিশের প্রশংসা আর মাস্টার না থাকার কাহিনী গৃহিণীর গোচর করে গেলেন।

২

অনেকগুলো বছর কেটে গেছে পড়া, পরীক্ষা আর পাশের বার্তা বহন করে নীতিশদের।

নীতিশ এসে পিতামহীকে প্রণাম করে বল্‌লে, 'ঠাকুমা, আমি ফাস্ট ক্লাস অনার্স পেয়ে পাশ করলাম।' নলিনও সঙ্গে ছিল, মেজ জ্যেঠার ছেলে প্রবীর সেও পাশ করেছে। সকলেরই দীপ্ত হাসি মুখ।

ঠাকুমা একটু হেসে সকলকে আশীর্বাদ করলেন, 'বেঁচে থাক, খুব ভাল হও' ইত্যাদি। 'ওসব নয় ঠাকুমা, তুমি যে বলেছিলে ভাল করে পাশ করলে বিলেত পাঠানোর কথা বলবে।' বহুদিন পূর্বের অন্য-মনে-দেওয়া প্রতিশ্রুতি পিতামহী ভুলে গেছেন, কিন্তু নীতিশের মনে আছে।

'ওমা তাই তো! তা বিলেত না গেলে কি লোকে মানুষ হয় না? এই তো তোর জ্যেঠারা যায়নি, তা কি কম কিছু হয়েছে?'

প্রবীর বল্‌লে, 'ওসব সেকেলে দিন এখন আর নেই ঠাকুমা, আমরা বিলেত না গেলে আমাদের কিছুই হবে না। না ভালো চাকরী, না পড়াশোনার দাম।'

নীতিশ বল্‌লে, 'আর মেজ জ্যেঠামশাই তো প্রবীরদাকে বিলেত পাঠাবেন ঠিকই করেছেন। ঐ সঙ্গে তুমি আমারো কথাটা ঠিক করে দাও।'

নলিন বাড়ীর দৌহিত্র। দয়ার অতিরিক্ত তার পাওনা নেই। পড়া হচ্ছে—এই যথেষ্ট, বাড়ীর লোকের প্রচ্ছন্ন মনের ভাব এইরূপ। তার ওসব স্বর্গের কল্পনার ভরসাও নেই, অধিকারও নেই। একটু অপ্রস্তুত অথচ খুসী ভাবেই সে শুধু হাসছিল। পাশ সকলেই করেছে—এক একজন এক এক বিষয়ে। ভাল করে অবশ্য নলিন আর নীতিশই। কিন্তু তার মধ্যে—প্রবীরের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সব কল্পনাই প্রবীর জানে। বিলেত গিয়ে তাকে মানুষ হয়ে আস্‌তে হবে এবং তার জন্য যা খরচ হবে তা তার বাবার আছে। এবং সে বিষয়ে সে যেমন অহঙ্কৃত, তেমনি স্বতৃপ্ত। নিজের কথা ছাড়া আর কারু কোনো কথা যে ভাববার আছে, মনেও করে না। তার অধিকার বোধ খুব সীমানা-ঘেরা। সুখের সৌভাগ্যের অধিকার যার আছে, তার আছে। যার নেই, তার ভাগ্যে নেই, তার আশা করাই অন্যায়, বা ভুল। এই তার মত।

নলিন তার কাছে কৃপার পাত্র। কেন তা সে নিজে ভাবে না, শুধু জানে শিক্ষালাভের নানাবিধ ব্যয়সাপেক্ষ আধুনিক উচ্চাকাঙ্ক্ষায় নলিনের অধিকার নেই। ভাল করে পাশ করেছে তাই ভালো। ভালো পাশ না করলেও নলিনদের চেয়ে তার নিজের দাম অনেক বেশী সে জানে।

স্কুলে-পড়া মেয়েও ক'জন তাদের মাঝে এসে বসেছিল। নীতিশের মেজ জ্যেঠার মেয়ে প্রবীরের বোন ইলা, বেলা। আর রমার মেয়ে বুলু টুলু। তারা আনন্দিত গর্বে নলিনের

প্রবীরের, মনীশের, নীতিশের সাফল্যের বার্তা শুনল। ইলার গর্বটা সাফল্যের ছাড়াও বেশী কিছুর, অর্থাৎ তার দাদা বিলেত যাবে। ইলা তার সুন্দর গর্বিত মুখে বল্‌লে, 'হ্যাঁ, দাদা তো ডাক্তারী বা অন্য কিছু বিষয়ে পড়তে যাবে ঠিকই রয়েছে, এর সঙ্গে নিতুদাকে ঠাকুমা, পাঠাবার ব্যবস্থা করে দাও, ভালই হবে।'

ঠাকুমা হাসলেন। কিছু বল্‌লেন না। ইলাদের ছোট মুখে বড় কথা তার শোনা অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল।

তার ভাই প্রবীর বল্‌লে, 'তুই থাম, তোর গিন্নিপনা করতে হবে না।'

রমা নিজের ছেলের অপ্রতিভ মুখের দিকে চেয়েছিলেন। বুলু একবার জননীর মুখের পানে তারপর টুলুর পানে চাইল।

টুলু তার মায়ের ভাগীদার, ভায়ের স্নেহের অংশীদার, নিতু-মামাও তাকে ভালবাসে—বুলু তাকে দু'চক্ষে দেখতে পারত না। কিন্তু আজ হঠাৎ তার মনে হল টুলুও খুব দুঃখিত হয়েছে তার মতনই নলিনের জন্য কেউ কিছু না বলাতে।

যাই হোক প্রস্তাবটা ঠাকুমার দরবারে পেশ করে ছেলেরা উঠে গেল অন্যত্র।

বুলু আর টুলু—বহুদিন পরে পাশাপাশি চুপি চুপি গল্প করতে লাগল। বুলু সুন্দর দেখতে, জেদী একগুঁয়ে মেয়ে। তার খামখেয়ালের অন্ত ছিল না, মেজাজ ভাল থাকলে সে যেমন উদার, মেজাজ বিরূপ হলে তেমনি নির্মম। তার

মেজাজের খাদ্যাচার ভীরু শান্ত প্রকৃতি কালো টুলুকে প্রায়ই সহ্য করতে হ'ত। সেজন্য নলিন-নীতিশের তার ওপর একটা সহৃদয় স্নেহ ছিল।

আজ বুলুর মন টুলুর প্রতি উদার হয়ে উঠেছে—টুলু পরম কৃতজ্ঞ ও কৃতার্থ হয়ে গল্পের অংশীদার হ'ল।

পুত্রদের রাত্রির আহারের সময় ঠাকুমা নীচে এসে বসলেন।

কিছু মিষ্টি বেশী এসেছে, হরির লুটের বাতাসা সন্দেশও এসেছে। নীতিশের মেজ জ্যেঠিমা সন্দেশ রাবড়ি দই আনিয়েছেন অনেকটা। এই অল্পক্ষণের মাঝেতো আর উৎসব ভোজের আয়োজন হয় না, সেটা সময়মত সকলের ছুটির দিন দেখে, তখন হবে। আজকে খানিকটা মিষ্টি মুখ হোক্। রমার সামান্য হরির লুট মানা ছিল, মাত্র সওয়া পাঁচ আনার, তারই বাতাসা আর বরফি ঠাকুমার সামনে রাখা ছিল। নিতুর জন্য ঠাকুমার পাঁচ সিকির হরির লুট মানা ছিল—এ ছাড়াও স্বগত অনেক মানসিক এখনো আছে—সে সব পরে হবে। ভোজের উৎসবের কথা ঠাকুমা বললেন না কিছু। তার অন্তরে তার একান্ত অনাথ আত্মীয়-হীনতার কথাই জাগছিল। তার জন্য কারুর কোনো কামনা আশা উদ্বেগ ছিল না, এখনো গর্বিত উৎফুল্ল আনন্দের প্রচার নেই।

বধূরা অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে শাশুড়ীর সামনে নিজের নিজের মিষ্টান্নাদি রেখে গেলেন।

গিরীশ সহাস্তে বললেন, 'এসব বুঝি আজ এদের পাশের মিষ্টি মা ? মেজ বৌমাকে বল শুধু মিষ্টিতে আমরা সেকেলে বামুন পণ্ডিতের মতন সন্তুষ্ট হচ্ছি নে।' বুদ্ধিমতী মেজ বৌমা শাশুড়ীর পিছনে জনান্তিকে বললেন, 'সে তো বট্ঠাকুরই খাওয়াবেন সবাইকে।'

শাশুড়ী মৃদু হেসে সেটা জানিয়ে দিলেন পুত্রদের। বড় ছেলে সন্তুষ্টভাবে হাসতে লাগলেন 'বেশ বেশ' বলে।

রমার সলজ্জ সঙ্কুচিতকায় বাতাসা থেকে তার মেজ খুড়িমার গর্বিত পুষ্টদেহ "আবার-খাব" সকলের পাতে পরিবেশিত হল। রাত্রে বড়দের সঙ্গে ছেলেরা খাবে এই ছিল বাড়ীর নিয়ম, কিন্তু কথা বড় বেশী তারা কইতে পারত না। অবশ্য বড় দাদারা কইতেন কথা। তবু সকলে যেন সকলের সঙ্গ পেত।

'তা হলে তারপর এবারে কি পড়া-টড়া হবে, না চাকরীতে ঢুকবি সব, কি ঠিক হচ্ছে ?' গিরীশ সন্দেশের খানিকটা ভাঙতে ভাঙতে জিজ্ঞাসা করলেন।

নীতিশ পিতামহীর মুখের দিকে চেয়ে কি এক উৎসুক আবেদন জানালে যেন।

মেজ ভাই হরিশ বল্লেন, 'আমি তো ভাবছি প্রবীরকে বিলেত পাঠাই ইঞ্জিনিয়ারীং পড়তে।'

'বেশতো ভাল বুদ্ধি করেছ, তাই দাও। আর নলে, তোর তো এবারে চাকরী করা দরকার, নয় ?' মাতামহ এবারে দৌহিত্রকে প্রশ্ন করলেন।

মেজকর্তা বল্লেন, 'ওর কিন্তু রেজাল্টটা খুব ভাল হয়েছে —ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছে, ফিজিক্সে। স্কলারশিপ পাবে মোটা। পড়লে ভালই হবে, পড়ায় কি আপনার মত নেই? না পড়লে স্কলারশিপটা পাবে না।'

'স্কলারশিপ পায় তো পড়বে বৈকি—পড়ুক।' গিরীশের আহার হয়ে গেল।

এবারে জননী বল্লেন, 'আর নিতুর কি ব্যবস্থা করবি?'

'নিতুর জন্য একটা চাকরী দেখছি। তা ছাড়া ও কম্পিটিটিভ্ পরীক্ষা দিক্ না, তাতে তো ভাল চাকরী হবে।'

জননী সসঙ্কোচে বল্লেন, 'ও যে প্রবীরের সঙ্গে বিলেত যেতে চাচ্ছে।'

তিন জ্যেঠা এক সঙ্গে অবাক হয়ে জননীর দিকে চাইলেন, তারপর চারদিকে চাইলেন অর্থাৎ নীতিশ কোথায়?

জননী অপ্রস্তুত হয়ে জিজ্ঞাসু ভাবে চেয়ে রইলেন। নীতিশ মাথা নিচু করে থালা দেখতে লাগল।

গিরীশ একটু হাসলেন। তারপর বল্লেন, 'বিলেত যাওয়া কি সোজা কথা মা, না সোজা খরচ? সে কোত্থেকে হবে?' আহার শেষ হয়ে গিয়েছিল।

জননী সঙ্কুচিত ভাবে চেয়েই রইলেন।

এবার গিরীশ আসন ছেড়ে উঠতে উঠতে বললেন, 'ওকে বিলেত পাঠাব আমাদের এত পয়সা কোথায় মা, ও এখানেই পড়ুক বা চাকরীর চেষ্টা দেখুক।'

কথা যেন সমাপ্ত হয়ে গেল। আর কিছু জিজ্ঞাসা করবার ভরসাও জননীর হল না। অথচ কেন যে প্রবীর যেতে পারে—আর নীতিশ একেবারেই কিছুতেই পারে না এটা নীতিশের বোধগম্য হ'ল না।

নীতিশের বিলাত যাওয়ার কথা চাপা পড়ল, কিন্তু তার বড় জ্যেঠামশাইয়ের মেজ ছেলে মনীশের প্রবীরের সঙ্গে যাবার ঠিক হয়ে গেল। সে ভাল করে পাশ করেনি বটে, পড়ায় মনও নেই কিন্তু যাক্ বিলাত, সেখান থেকে ব্যারিস্টারীটা চেষ্টা করে পাশ করে আসুক—তা না হলে এখানে ওর কিছুই হবে না।

জ্যেঠ্তুতো ভাইয়েরা বোনেরা সকলে মিলে অতি উৎসাহের সঙ্গে বাইরের পড়বার ঘরে এই সব কথা আলোচনা করছিল। টুলু বুলু নলিন নীতিশও ছিল। একটু বিমনা ভাবে।

প্রবীর উৎসাহিত ভাবে বললে, 'আসল কথা কিন্তু সবের আগে টাকা। বাবা তাই বলছিলেন, যতই ভাল করে পাশ কর বা লেখাপড়া শেখ, টাকা না থাকলে কিম্বা টাকা না ঢাললে কিছুই হয় না।'

নলিন মৃদু প্রতিবাদ করলে, 'মানে তুমি বলতে চাও মানুষ হতে গেলে গোড়াতে তার টাকা থাকা চাই বা বড়লোকের ছেলে হওয়া চাই ? তা হলে এত লোক যে ছোট থেকে বড় হয়েছেন তা কেমন করে হ'ল ?'

'ওসব 'এক্সেপসন্' ব্যতিক্রম। দু-একজন অমন হয়!

নইলে দেখ না, লেখাপড়া ভাল করে করলে অথচ চিরকালই কোনো রকমে জীবন কাটাচ্ছে। তাদের টাকা নেই তাই কিছুই করতে পারল না।'

নীতিশ বললে, 'তাহলে তোমার মতে টাকাই সব চেয়ে বড় জিনিষ। তবে টাকাওয়ালা বেনে, ব্যবসাদার, জমীদারদের চেয়ে বিদ্বান জ্ঞানীর আদর বেশী হয় কেন?'

মনীশ চুপ করে ছিল, এবারে বললে, 'সে ক'টা? বড় বড় কলকারখানাওয়ালা, ব্যবসাদার, বেনে, মাড়োয়ারী ঐ সব তোমার বিদ্বানদের কিনে নিতে পারে তা জানো? ঐ ওদের কাছেই চাকরীর জন্যে তোমার বিদ্বানরা স্কলাররা ঘুরে বেড়ায় না কি?'

নলিন বললে, 'তার কোনো মানে নেই। টাকা থাকলে অনেক কিছু করা যায় বটে কিন্তু শুধু টাকার জোরেই সব হয় না। বিদ্বানদের কিনে নিতে পারে হয়ত, কিন্তু বিদ্বান খুঁজতেও তাদের হয় নাকি তাদের বিশেষ বিদ্যার জন্যে? শুধু টাকার জোরেই তো কারখানা চলে না।'

প্রবীর বললে, 'তা হয় বটে, কিন্তু কারখানার গোড়ার কথাই মূলধন অর্থ, নয় কি?'

নীতিশ বললে, 'সঙ্গে সঙ্গে পরিশ্রম বুদ্ধি ধৈর্য্যও। বড় বড় ব্যবসার গোড়ায় মূলধনের চেয়ে বুদ্ধি ধৈর্য্য শ্রমই বেশী দেখতে পাবে। বিদ্যার ছাপ না থাক, জ্ঞানকে বাদ দিতে পার না। শুধু টাকায় হয় না কিছু।'

প্রবীর উষ্ণভাবে বললে, 'সে কথা যাক্। আমার কথা হচ্ছে এই টাকা না থাকলে তোমাকে কেউ চিনবে না, মান্‌বে না। সমাজের মাথার ওপর দাঁড়াতে গেলে, আভিজাত্যের শিখরে পৌঁছতে গেলে আগে দরকার টাকার।'

নীতিশের বন্ধু প্রতুল এসেছিল, সে শুন্‌ছিল। সে একটু হাসলে, বললে, 'হয় তো খানিকটা তাই। কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ—সমাজকে বা মানুষকে যারা চালায় বা তার শিখরে থাকে তারা সকলেই ধনী নয়। প্রথমেই ধনী ছিলও না। তুমি মহাত্মা গান্ধী, বিদ্যাসাগরমশাই, বিবেকানন্দ কত লোক কারুকেই টাকায় বড়লোক বা ধনী বলতে পার কি? তুমি যে অভিজাত বা আভিজাত্যের কথা বলছ তা তো হচ্ছে, অতি সাধারণ বড়লোকীয়ানা। জিনিষে-পত্রে, গাড়ী-বাড়ীতে, আরামে-স্বাচ্ছন্দ্যে অভিজাত নামে জীবন-যাত্রার নির্বাহ। সেটা কি মনের আভিজাত্য, না, সমাজের শিখরে, মানুষের মনে পৌঁছন হয় তাতে?'

মনীশ বললে, 'তা হলে কি আপনি বলেন বড়লোকের আভিজাত্য মনের আভিজাত্য নয়?' প্রতুল হাসলে, বললে, 'না আমি তা কিছু বলছি না, আমি বলছি এই, আভিজাত্যের গোড়ার কথা শুধু টাকা নয়।'

প্রবীর বললে, 'কিন্তু টাকা না থাকলে যে আভিজাত্য দাঁড়ায়ই না, বিলেতেই বা কি এখানেই বা কি, দেখেন না? শুধু অবাস্তব মন নিয়ে তো আর দুনিয়া চলছে না। যেখানে

যেখানে ধনী অভিজাত সম্প্রদায় তার চারদিকে, তাকে ঘিরেই কি জ্ঞানী গুণীদের সমাবেশ হচ্ছে না ?'

নলিন বললে, 'কিন্তু ধন-ঐশ্বর্য্যহীন. জ্ঞানী, গুণী, সাধু, মহাত্মাদেরও তো ঐ রকম অভিজাত ধনীরা ঘিরে থাকে দেখা যায়।'

এবারে মনীশ বিরক্ত হয়ে বললে, 'সাধারণ মানুষের সঙ্গে তো আর অসাধারণের তুলনা চলে না। এই তো নিতু, তাহলে সাধু মহাত্মাই হোক না, বিলেত যাবার জন্যে নেচে উঠেছে কেন ?'

আকস্মিক ব্যক্তিগত আক্রমণে সকলেই আশ্চর্য্য হয়ে গেল। নীতিশ জানত সে যেতে পাবে না, সেজন্য মনে মনে খুবই ক্ষুণ্ণ হয়ে ছিল কিন্তু সেটা নিয়ে তাকে যে সাধু মহাত্মা হওয়ার কথা বলে শ্লেষ করা হবে, এটাতে সকলেই অবাক হয়ে গেল।

নীতিশের কান লাল হয়ে উঠল। নলিন বললে, 'এ তোমার ব্যক্তিগত করে কুতর্ক মেজো মামা।'

মনীশ বললে, 'তা তোমরা তর্ক করছ তার উত্তরে যা বলা যেতে পারে আমি বলব। কুতর্ক সুতর্ক আবার কি ?'

মনীশ উঠে গেল।

বিরাট অট্টালিকাতে যদি নিজের ঘরখানি একেবারে শেষ সীমান্তে হয়, তাতে পৌঁছবার আগে অনেক ঘর অনেক জন অতিক্রম করতে হয়, হয়ত কিছু কথা বলতে হয়, কাজও

করতে হয়, বড় বাড়ীতে বহু পরিজনের মাঝে মানুষ হওয়া নীতিশের তেমনি নিজের ভাবনা ভাবার আগে বহু স্বজন বহু সৌজন্য আলাপ পার হয়ে যেতে হয়। নিজের কথা ভাববার বলবার মত স্থানই যেন নেই, থাকলেও এতই অনভ্যস্ত যে মন যেন কোথায় সঙ্কোচে লুকিয়ে পড়ে।

আর বড় পরিবারে কথার আঘাত তো একটা লীলার মত। প্রতি নিয়তই শ্লেষ-বিদ্রূপ, হাসি-রহস্য, সুখ-দুঃখ-বেদনার তরঙ্গভঙ্গ চারিদিকে বয়ে যাচ্ছে।

তবু যে কথা অনুচ্চারিত থাকে সে কথা যে লুকোনো থাকে তা নয়।

নলিন অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হ'ল। তার নিজের মামা মনীশ কিন্তু নীতিশ যেন বেশী আপনার তার। দারিদ্র্য ও দয়ার পাত্র হিসাবে তারা এক।

ওর মা রমাও নীতিশকে খুব স্নেহ করে। নীতিশের জননী আর রমা সমবয়স্ক, বন্ধুর মত ছিল। তা ছাড়া পিতৃমাতৃ-হীন নীতিশ আর পিতৃহীন রমার ছেলেমেয়েদের যেন একটা কোনখানে বিশেষ মিল ছিল এই সংসারে। সে মিলটা অন্যদের গর্বিত অবজ্ঞার এক স্তরের মাঝে ওদের বেশী এক করে দিয়েছিল যেন।

যাই হোক, তর্কের সারাংশ কেমন করে বুলু টুলুর মারফৎই হোক বা প্রবীরের মার বোনের কাছ থেকেই হোক অন্তঃপুরে এসে পৌঁছল।

বৈকালে জলযোগের সময় ছেলেরা কেউ কেউ একবার মার কাছে আসেন।

সেদিন জননী গিরীশকে বললেন, 'মণি যাবে, প্রবীর যাবে বিলেত, তা নিতু যাক্ না, তিন ভাই এক সঙ্গেই যা পড়তে চায়, পড়ে আসুক না ?'

গিরীশ বললেন, 'প্রবীরকে তার বাপ পাঠাচ্ছে, মণিকে আমি পাঠাচ্ছি, নিতুর খরচের টাকা কই ?'

হরিশ বললেন, 'আমি পিবের জন্যে অনেক দিন থেকে টাকা রাখছি। এখানে লেখাপড়ার আর দাম কই।'

মা বললেন, 'সেই জন্যেই তো নিতুও ব্যস্ত হচ্ছে, তা ওর কি কোনো টাকা নেই ?'

গিরীশ বললেন, 'ওর টাকা আর কই ? ওর বাপ তো গান বাজনার সখে বড় বড় ওস্তাদ পুষে, দেশ বিদেশে ঘুরে বহু টাকা নষ্ট করেছে। বাবা অনেকই ওকে দিয়েছিলেন নষ্ট করতে। তারপর যা ছিল সামান্য—ওকে তো মানুষ করতে হচ্ছে !'

বধূমাতারা এসে স্বামীদের চা খাবার ইত্যাদি দিয়ে গেলেন। তিনজন ছেলে খেতে লাগলেন। রমা পান আর জল নিয়ে এলো।

বাইরে বৃষ্টি এলো গুঁড়ি গুঁড়ি।

মা চুপ করেই বসেছিলেন। বলবার কিছু ছিল না তাঁর।

এবারে গিরীশ বললেন, 'তা ছাড়া বাবা তো উইল করে

যামনি। উইলে নীতিশকে কিছু দিলে নীতিশ পেতো। আমাদের সঙ্গে এক ভাগ ওর হতে পারত।'

এবারে উৎসুকভাবে জননী বললেন, 'সে তো ওর পাবার কথাই, আমি সেই কথা, সেই টাকার কথাই জিজ্ঞেস করছিলাম।'

গিরীশ বললেন, 'সে যদি বাবা উইল করে দিয়ে যেতেন, ও পেতো। কিন্তু সে ব্যবস্থা বাবা তো কিছু করেননি কাজেই সেটা আইনতঃ আমাদের তিন ভাইয়ের মধ্যে তিন ভাগ হয়ে গেছে। সে টাকা থাকলে ওর বিলেত যাওয়ার খরচ থাকত। কেননা সেটা থোকে খানিকটা টাকা কিনা। নরেশ অনেক নষ্টও করে ছিল, তাইতেই আর নিতেকে এখন আমাদের দিতে পারা শক্ত।'

মা চুপ করে রইলেন। তার মনে হতে লাগল আইনত না পেলেও কি পাওয়া উচিত ছিল না? ধর্মত সে তো একজন পাবার অধিকারী। কত নষ্ট করেছিল সে, যত পরিমাণ এরা পেয়েছে তত কি? ব্যয় ও অপব্যয় তো সকলেই করেছে। কিন্তু কিছু বলতে পারলেন না।

হরিশ বল্লেন, 'বাবার ওটা না করা ভুল হয়েছিল, উইল করা থাকলে সবই ঠিক করা যায়।'

সেজ ছেলে বল্লেন, 'সেকালের লোকদের ঐ রকম বুদ্ধি ছিল। উইল করলেই তো মানুষ মরে যায় না, এই তো সাহেবরা কত শীঘ্র ঠিক সময়ে উইল করে রাখে!'

এই মন্তব্যে সাহেবদের বুদ্ধির ওপর মার হয়ত একটু শ্রদ্ধা হল। অবশ্য তিনি বুদ্ধিমান হলে যে এ ক্ষেত্রে ছেলেদের সঙ্গে

নিতুর ভাগ সমান হ'ত একথাও জননীর মনে হ'ল। যাই হোক, ওরা তো ছুটো সুযোগ পেল—তাঁর নির্বুদ্ধিতার ফল সম্পত্তি বিষয়ও, তাঁকে নির্বোধ বলারও। তা তিনি হয়ত বুঝলেন না।

তিনি বল্লেন, 'তাহলে নিতুর কিছুই নেই? এই সব ভাগের মাঝে? বাড়ীতেও ভাগ নেই?'

গিরীশ বল্লেন, 'কই আর! ঐ সামান্য কয়েক হাজার টাকা ওর বাপের লাইফ ইন্সিওরের আছে—আর ছোট বৌমার গহনা তোমার কাছেই আছে।'

নিতুর পিতামহী নীরবেই রইলেন।

ছেলেরা জলযোগ শেষ করে নিজের নিজের ঘরে অথবা বেড়াতে চলে গেলেন। জননী ভাবতে লাগলেন, তাঁর নিজের গহনা টাকা কি আছে? কি আছে? কতটুকু সে? বৃহৎ পরিবারের বহু জনকে দেওয়ার পর আর কতটুকু আছে।

বারান্দায় প্রবল সমারোহে কোরাসে তখন বালক-বালিকাদের বৃষ্টির আহ্বান চলেছে—

"আয় বৃষ্টি হেনে
ছাগল দোব মেনে
ছাগলের মা বুড়ি,
ছ'খান কাপড় পেলি,
ছ'বৌকে দিলি
আপনি মরিস জাড়ে,
কলা গাছের আড়ে"—

উৎসুক নীতিশ কাছাকাছি কোন খানে ছিল, জ্যেঠা মশাইদের দরবারের 'রায়' কি হল জানবার জন্য, সে এসে দাঁড়াল। 'কি হল ঠাকুমা যেতে পাব ?'

'নারে,—তোর কোনো টাকা নেই, ওরা বল্‌লে।'

'কেন ? দাদার টাকা নেই ? সেই টাকাতেই তো প্রবীর যাচ্ছে, মনীশদা যাচ্ছে।'

ঠাকুমা বল্লেন, 'না, সে টাকা উনিতো উইল করে যাননি, সেই জন্য সে টাকায় তোর ভাগ নেই।'

নীতিশ অবাক হয়ে গেল, বল্লে, 'বাবার ভাগ আমার নেই ?'

ঠাকুমা বল্‌লেন, 'আইনে নাকি নেই। তা ওরা বল্‌লে বিলেত না গিয়ে কি আর মানুষ হয় না ? তা নাইবা গেলি ?'

নীতিশ ম্লান ভাবে একটু হাসলে।

ঠাকুমা ভাবতে লাগলেন। আছে কি ? তাঁর কি আছে ? কত টাকা হলে নিতুর বিলেত যাওয়ার খরচ কুলোয় ? জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোর কত টাকা লাগবে রে, আমার তো সামান্য হাজার দুইয়ের গয়না আছে, তাতে হয় ? আর সব তো সব বৌ ঝিকে আশীর্বাদ করে দিয়ে ফেলেছি। টাকা তো আগেই ছেলেরা নিয়েছে, আমার আলাদা টাকার কি দরকার বল্‌লে, দিয়ে দিয়েছিলাম তখন।'

নীতিশ হাসলে, বল্‌লে, 'না ঠাকুমা, ওতে কিছুই হবে না, তা ছাড়া ও তোমার গহনা, ও নেওয়া যায় না।' দুজনেই চুপ করে রইলেন।

বাল্য মেঘদূতের কোরাস আহ্বানের শেষ লাইন তখন স্পষ্ট হয়ে কানে এলো—

"আপনি মরিস জাড়ে
কলা গাছের আড়ে,
কলা পড়ে টুপ টাপ,
বুড়ী খায় কুপ কাপ।"

নীতিশের মুখে একটু অন্য রকম মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল। মনে হল, এই ছেলে ভুলানো ছড়াটির রচয়িতার বেশ রসবোধ ছিল। একটু স্থুল তবু চমৎকার। কিন্তু ঠাকুমা ছড়া শুনছিলেন না, ভাবনায় নিমগ্ন ছিলেন।

নীতিশ উঠে গেল। প্রবল বেগে বৃষ্টি এলো।

আগস্ট অর্থাৎ ভাদ্র মাসে বিলাত যাত্রার সময় সাধারণত। ইতি মধ্যে পাশ করার, তারপর বিলাত যাওয়ার বিদায়ী-ভোজের সমারোহ পড়ে গেল।

যাঁদের বিবাহযোগ্যা মেয়ে ছিল, যাঁরা মনে মনে আঁচ করে রেখেছিলেন, মুখেও আভাস দিয়েছিলেন ছেলেদের মা বাপের কাছে, তাঁরা এই বিদায়ী ভোজের অন্তরালে একটা কথা পাকা করে নেবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠলেন।

সুবোধ মুখুয্যে ব্যারিস্টার, হরিশের বন্ধু, আর বিবাহযোগ্যা মেয়েরও বাপ, এবং তাঁর ছেলেরাও ওদের সঙ্গে পড়ে, পৈত্রিক ও স্বোপার্জিত সম্পত্তিও প্রচুর আছে; মেয়েদের চেহারাও

ভালো, আবার লেখাপড়াও করছে; এ সুযোগ তিনি ছাড়লেন না।

এতদিন অবধি নীতিশই তাঁর "চাঁদমারি" ছিল। এক ছেলে, বিষয়ের ভাগী কেউ নেই তাই। এখন হঠাৎ দৃষ্টি অন্যত্র গেল, নীতিশ বিলাত যাবে না শুনে।

কিন্তু নিমন্ত্রণ তো তিন জনকে করতে হয়। সুতরাং সকলেই একটা দেশী-বিদেশী মিশ্রিত ভোজে নিমন্ত্রিত হল।

পিতার সম্পত্তি নীতিশ পায়নি বটে কিন্তু গান বাজনার পৈত্রিক ঝোঁকটা পেয়েছিল। বাঁশী বাজাত চমৎকার, বেহালার হাতও মন্দ ছিল না।

মুখুয্যে সাহেবের বড় মেয়ে সুমিত্রার সঙ্গে তাদের কারো একজনের বিবাহের সম্বন্ধ হচ্ছিল, এর আভাস তারা পেয়েছিল।

কে যে পাত্র তা পাত্ররা জানত না। মনীশ ভাবত সেই পাত্র, প্রবীরও ভাবত হয়ত তাই। নীতিশও আভাস পেয়েছিল দিদির কাছে—নীতিশই ওই পাত্র, ঠাকুমার কাছে প্রস্তাব এসেছে।

যাই হোক, মেয়ে মুখুয্যে সাহেবের চারটি, সুমিত্রার পর ঊর্মিলা আছে, দেখতে সবাই ভালো এবং নৃত্য গান-বাজনা পড়ায় ঠিক আধুনিক।

নীতিশের বেহালা ও বাঁশী বহু জনমনকে আকর্ষণ করেছিল, তার মধ্যে বাড়ীর টুলু বুলু আর বাইরের সুমিত্রা ঊর্মিলাদের।

ভাইদের বন্ধু হিসেবে নীতিশের যাতায়াত ছিল, গান-বাজনা শোনার সুযোগও ছিল।

সুমিত্রার গান হল। উর্মিলাও কি দুএকটি গান গাইলে।

এবারে মুখুয্যে সাহেবের এক ছেলে নীতিশকে বাঁশীতে "কূল হতে মোর গানের তরীটা" বাজাতে বললে। গানের পরে বাজনা, আবার গান, অবশেষে আবার বাঁশী।

বাড়ীর সামনের বাগানে বর্ষার সন্ধ্যা শেষ হয়ে গেল।

নীতিশ বাঁশীটা রেখে ঘরের খোলা জানালার কাছে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে দাঁড়াল।

পাশের ঘরের জানালা থেকে কানে এলো, 'ওই ছেলেটি ? চেহারাটি বেশ ভাল, বুদ্ধিমান চেহারা। বাঁশী বেশ বাজালো।'

'না, ওটি নয়, আগে ঐটাকেই ঠিক করেছিলাম, এখন শুনছি ওর কিছু নেই। ওর ঠাকুর্দা ওকে কিছুই দিয়ে যেতে পারেননি, উইল করেননি। খুব ভাল ছেলেটি কিন্তু এখন মনীশ ব'লে ছেলেটির সঙ্গেই সুমিত্রার ঠিক করে ফেলছি। যদিও অনেকদিন আগে থেকেই এর সঙ্গে কথা কয়ে রেখেছিলাম, মেয়েও তাই জানত।'

জবাব হ'ল, 'তাতে কিছু হবে না, আলাপ করতে দাওনিত ?'

নীতিশ সরে যেতে পারল না, কি একটা উন্মুখ কৌতূহল তাকে ধরে রাখল সেখানে।

'না তা দিইনি, তবু বড় হয়েছে, চেনা পরিচয় আছে দু' বাড়ীতে।'

'তা বটে। আর এই ছেলেটি কি বল্‌লে নাম নীতিশ না কি? এটিকে ওদের সকলের চেয়ে বুদ্ধিমান আর গভীর প্রকৃতি মনে হয়। পাত্র হিসেবে ভালো হত।'

'তা হলে কি হয়, একটা ভিখিরির সঙ্গে তো বিয়ে দিতে পারি না। কিছু নেই ওর, ওর জ্যেঠারাই বল্লে সেদিন।'

'কিন্তু দিদি একদিন বলছিলেন আমাকে, এরই ওপর মেয়েদের ঝোঁক। তা তুমিতো মেয়েদের অনেক টাকা দিচ্ছ, তাতে কি ওর বিলাত যাওয়া হয় না?'

'বিলাত যাওয়া হবে না কেন, তারপর কিছু হয়ে আসেন তো ভাল, না হলে 'অদ্যভক্ষ্যধনুর্গুণের' ঘরে আমার মেয়ের কি সুখ হবে।'

'তা হলে কিন্তু তোমার আজ একে নিমন্ত্রণ না করা ভাল ছিল! ভাল করনি এটা।'

'তা' আর কি করে করি, ওদের এক বাড়ী, চিরকাল যাওয়া-আসা করছে। তা ছাড়া ছোকরা গান-বাজনায় ভাল, একটা সকলের 'এনটারটেনমেণ্ট' হবে। বেশ বাজালো বেহালা বাঁশী, নয়?'

অনিচ্ছাতেও সব কথা কানে গেল। নীতিশের কান দুটি গরম হয়ে উঠল—এন্‌টারটেনমেণ্ট! ঐটিই বাকি আছে—মনোরঞ্জক তারপরে কি বিদূষক? বিয়ের কথা বা কল্পনা নীতিশ করেনি কিন্তু বয়সের ধর্ম, সুমিত্রাদের প্রশংসমান দৃষ্টি সেগুলোও কম নয়। তারপর ভিখিরী 'অদ্যভক্ষ্যধনুর্গুণ'। 'ক'দিন আগে

মনীশরা বলেছে সাধু মহাত্মা হতে। নীতিশ আস্তে আস্তে বাগানে নেমে গেল। সহসা দেখল একেবারে পথে বেরিয়ে এসেছে।

ঘনীভূত শ্যামল ভাদ্রের সন্ধ্যায়, কারো চোখ পড়লনা, ঘরে তখন আর কার গান সুরু হয়েছে।

বন্ধুহীন নিঃস্ব নিঃসম্বল সমবেদনাহীন অদ্ভুত জগত যেন ডিমের খোলার মত কঠোর আবরণে তাকে ঘিরে নিয়েছে। মা নেই, বাবা নেই, ভাই-বোন, স্বজন কেউই নেই।

তেতালার চিলেকুটরীতে বসে বসে টুলু আর বুলু পড়ছিল। রাত্রি অনেক হল, বুলু ঘুমুলো সেইখানেই কিছুক্ষণের মত।

টুলুরও অনেক পড়া হয়েছে—সে ছাতে বেরিয়ে এলো। বৃষ্টিহীন মেঘলা আকাশ, থমথম করছে, আলো নেই, রূপ নেই, আকর্ষণ নেই। যেন ঘোলাজল-ভরা বন্যাপ্লাবিত শ্রীহীন দেশ। টুলুর মনে হচ্ছে যেন ওটা আকাশ নয়।

টুলু ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সহসা ছাতের এক কোণের কাছে কে যেন সোজা হয়ে দাঁড়াল। এতক্ষণ টুলুর চোখ পড়েনি।

টুলু চমকে বল্লে 'কে?' তার পরেই বল্লে, 'নীতুদা? এতরাত্রে ছাতে দাঁড়িয়ে আছ? কেমন নেমন্তন্ন খেলে? ওরা বললে তোমাকে ওরা দেখতে পায়নি? কোথায় ছিলে এতক্ষণ?'

নীতিশ বল্লে, 'আমি একটু অন্য জায়গায় বেড়াতে গিয়েছিলাম।'

'সেকি?—ওখানে যাওনি?'

'একটুখানি ছিলাম ওখানে।' অকস্মাৎ একটু অদ্ভুতভাবে হেসে বল্লে, 'বাঁশী বাজিয়ে ওদের অভ্যাগতদের 'এন্‌টারটেন্‌' করে এলাম। বিদূষক হয়ে ওঠার আগের অবস্থা এখন।'

বুলুর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, কখন নিঃশব্দে সে এসে ওদের পিছনে দাঁড়িয়েছিল। সে বল্লে, 'ও তাই মেজমামা বলছিল, নিতুর বাঁশী বেহালার খুব সুখ্যাতি হ'ল।'

নীতিশ সেইরকমই হেসে বল্লে, 'ও, বল্লে বুঝি ওরা। একটা সার্টিফিকেট হ'ল।'

বুলু টুলু ঠিক বুঝতে পারল না ওর কথার ধরণটা।

হঠাৎ যেন অসহিষ্ণু হয়ে উঠল নীতিশ, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তার মনে হল ওদের বলে, 'তোমরা যাও, চলে যাও তোমরা, কেন দাঁড়িয়ে আছ ভাল বাঁশী-বেহালার প্রশংসা শোনাতে। আমি শুনতে চাই না, চাই না। তোমাদের কথা, তোমাদের প্রশংসা, তোমাদের বাড়ীর লোকজন, তোমাদের বাড়ীর ইঁটকাঠ দেওয়াল ঘর সমস্ত আগুনের মত গরম হয়ে উঠেছে। তার মনে হতে লাগল সমস্ত বর্ষার ঘোলা আকাশ যদি তার সব জল নিয়ে ভেঙে পড়ে এখনি, প্লাবিত করে দেয় ওদের, তবু যেন ওই আগুনের গরম কাটবে না। নীতিশ ছাতের ও-প্রান্তে গিয়ে আলিসার ওপর ঝুঁকে দাঁড়াল—মানুষের সঙ্গ তার যেন অসহ্য হয়ে উঠেছে। বুলু-টুলুর কি এমন বুদ্ধি নেই যে সে কথা বুঝতে পারে? বুলুরা কিন্তু নিঃস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। শান্ত নিরীহ গভীর প্রকৃতি নীতিশকে ওরা চেনে, এই তীক্ষ্ণ রূঢ়ভাষী নীতিশকে তারা চেনে না। ভয়ে কুণ্ঠায় তারা চুপ করে স্থাণুর মত সেখানে দাঁড়িয়েই রইল।

এতক্ষণে ঘোলা আকাশে যেন একটা চিড় খেয়ে বিদ্যুৎ চমকে উঠল। তারপরে নিঃশব্দে বর্ষণ সুরু হয়ে গেল।

ছাতের দু' কোণে তিনটি প্রাণী আকাশের মতই অ-স্বচ্ছ অদ্ভুত চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে সেই নিঃশব্দ বৃষ্টিতে ভিজতে লাগল, যেন আর কোনো কিছুই আজ তাদের করবার নেই এই ভেজা ছাড়া। যে ভেজা অন্যদিন তাদের গল্পের গানের আনন্দের কাহিনী বহন করে আনে, দুজনে শেওলা পড়া ছাতে ঘুরে ঘুরে ভিজে বেড়ায়, কখনো কখনো নলিন নীতিশও আসে, কখনো অন্য মেয়েরা। আজকে সে আনন্দ বা সে গান কিছুই নেই, গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টিতে তাদের মাথা ভিজে গেল, কাপড় সেঁতিয়ে ভিজে গেল কিন্তু তাদের যেন নড়বার শক্তি ছিলনা।

সহসা সিঁড়ির ওপরে রমাকে দেখা গেল। টিনের ঘরে উঁকি মেরে তিনি দেখলেন একবার, কেউ নেই! ছাতের ওপরে উঠে এলেন।

'তোরা ভিজছিস্, মাথা খারাপ হয়ে গেছে? ঘরে আলো জ্বলছে আর তোরা এখানে। আর নিতু এখনো ফেরেনি?'

ওরা নীতিশের দিকে তাকালো জননীর চোখও সেদিকে পড়ল। এক নিমেষে সমস্ত রূঢ়তা তীক্ষ্ণতা আত্মস্থ করে নীতিশ এগিয়ে এলো। রমা বল্লেন, 'এত রাত হ'ল তোর? ওখানে যাসনি?'

নীতিশ বল্লে, 'হ্যা, গিয়েছিলাম বইকি।' তারপর একটু উন্মনভাবে বল্লে, 'দিদি একটু চা খাব কি? মাথাটা ধরেছে।'

'এত রাত্রে ? কেন কিছু খাওয়া হয়নি বুঝি তোর ? তাই মণিরা বল্লে তোকে ওরা ওখানে দেখতে পায়নি। যা টুলি, চায়ের ঘরে পাঁউরুটী মাখন আছে ওকে দিগে। এত রাত্রে কিন্তু স্টোভ জ্বাল্‌লে দাদা, বৌর ঘুম ভেঙে যাবে, বিরক্ত হবে। স্টোভ জ্বালিস্‌ নি, নীচে রান্না ঘর থেকে জল গরম করে নে।'

স্টোভ জ্বল্‌ল না ; দোতলার সিঁড়ির পাশে চায়ের ঘরে টুলু দাঁড়িয়ে রুটী কাটছিল, নীতিশ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল, বুলু জল গরম করতে গিয়েছিল। বুলুর বড় মামী নিঃশব্দে এসে এক মুহূর্ত্ত দাঁড়ালেন, 'এত রাত্রে রুটী কাটছ টুলু কে খাবে, নিতুর অসুখ করেছে ? আমার সকালের পাঁউরুটী উঠিয়ে দিয়ো না সব।'

টুলু অপ্রস্তুত হয়ে চমকে ফিরে চাইল, তারপর নীতিশের দিকে চাইল। নীতিশও অপ্রতিভ হয়ে বল্লে. 'না বৌদি, অসুখ করেনি।' কিন্তু রুটী মাখন চা খাওয়ার কৈফিয়ৎ এত রাত্রে আর কিছু মনে বা মুখে এলো না। আর কিছু বলবার আগেই বৌদি নিঃশব্দে ফিরে গেলেন। বুলু গরম জল নিয়ে উঠে এলো। বুলুর কানে পাঁউরুটীর কথা গেল।

টুলু অপরাধিনীর মত পাঁউরুটীর দিকে চেয়েছিল। ওটা খাদ্য বটে কিন্তু কাকে দেবে ও কার খাবার টুলু তা যেন বুঝতে পারছিল না। বুলুও জানে সেকথা কিন্তু সে তো বাড়ীর মেয়ে —সে চা এবং রুটীর টুক্‌রা ক'টা নিতুর সামনে দিল।

নিতু চায়ের পেয়ালাটা শুধু হাতে করে নিল। মাখন মাখা রুটী দু'খানা টেবিলের ওপর প্লেটে ঝিকমিকে ছুরীর পাশে শুয়ে রইল যেন বৌদির ধারালো মন্তব্যের পাশে টুলু-বুলুর মত।

নিতু পিছন ফিরে জানলা দিয়ে বাইরের বৃষ্টি ও অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইল। তার কানের কাছে বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে বিকালের শোনা কথার সঙ্গে, বৌদির রুটীর মন্তব্য, সেদিনের 'মহাত্মা' হবার কথা যেন কুইনাইন খাওয়া জ্বরবন্ধের মত নানা সুরে গুঞ্জরিত হতে লাগল। অকস্মাৎ যেন সে বুঝতে পারল তার পায়ের তলার মাটী তার নয় এবং সুমুখের স্লাইস্ কাটা রুটীতেও তার কোনো দাবী নেই। মাটীতে সে শুধু দাঁড়িয়ে আছে এবং রুটী সে পায় তাই খায়।

বুলু অনেকক্ষণ পরে বল্লে, 'নিতু মামা তুমি খাও। আমরা কাল সকালে রুটী খাব না। তাহলেই কম হবে না।'

টুলুর কথা বলার সাহস নেই, সে নিতুর চেয়ে অক্ষম স্তরের জীব—এ বাড়ীর দৌহিত্রীর পিসি। সে তার কালো মুখে সুন্দর কালো চোখ-দুটি মেলে স্থির ভাবে চেয়েছিল। কি ভাবছিল ওরা, তা কেউ জানে না। হয়ত নিতুর খাওয়ার কথা ভাবছিল, নয়ত বৌদির নির্লিপ্ত অথচ দৃঢ় কর্ত্রীত্বের দাবীর ঘোষণা তাদের অন্তরকে পীড়িত কচ্ছিল কিম্বা কিছুই নয়। কিন্তু তাদের অজ্ঞাতেই তাদের শান্ত মুখে যেন আশ্রয়হীন অন্ন-হীনের লাঞ্ছিত অবমাননার চিরন্তন কাহিনী ফুটে উঠেছিল।

অবশ্য কাল তারা আবার সব খাবে, হাসবে, আবার গল্প করবে এবং এই বাড়ীতেই এখনো বহুদিন হয়ত থাকবে—তবু। সহসা ওরা পেছন ফিরে দেখল নিতু ঘরে নেই।

দেখতে দেখতে বিলাত যাত্রার দিন ঘনিয়ে এলো। 'সী অফ' করতে হবে অর্থাৎ পৌঁছতে যেতে হবে কিন্তু ইংরাজীতে না বল্লে বলেই সুখ নেই তাই সকলেই বলে 'সী অফ'। যাক্, কিন্তু পৌঁছানোটা বোম্বাইয়ে নয় এখানেই হাওড়া স্টেশনে। শুধু প্রবীরের মা বাপ বোম্বাই যাবেন। বড় গিরীশবাবু সেকেলে ধরণের লোক, বড় গৃহিণী ততোধিক অনাধুনিক। বিলাত যাত্রার ভালো মন্দ দূর নিকট তাঁর নিতান্ত সোজা জানা। বিলাত থেকে ফিরে লোকে খুব ভাল চাকরী পায় অথবা প্রচুর উপার্জ্জন করে এই ভালো। দূরত্বও তাঁর সাগর পার জ্ঞান মাত্র। এই মানুষকে নিয়ে তো আর সভ্য ভাবে রুমাল উড়িয়ে পৌঁছে দেওয়া চলে না।

সুতরাং মনীশের মা পুজা-অর্চ্চনা হরির লুট সত্যনারায়ণের সিন্নি এই সব মানসিক ও বিমনভাবে যাত্রার আয়োজন করতে লাগলেন। শুধু তাঁর মন কেমন করে মনীশের খাওয়ার জিনিষ নিয়ে। প্রতিদিনই তাঁর রান্নার আয়োজন বিরাট হয়ে যায়, আর মনীশ বলে, 'মা কি ফাঁসীর খাওয়া খাওয়াচ্ছ!'

মা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে 'ষাট্ ষাট্' বল্লেন।

নীতিশ সহসা সকলের থেকে যেন অনেক দূরে চলে গেছে। বিশেষ কোনো কথাই সে কারু সঙ্গে বলে না। একটা কি-ভাবে মুখ প্রসন্ন করে রাখে। বুলু-টুলু নলিনের সঙ্গে গল্প করে—একই রকম। প্রবীর-মনীশের অহঙ্কৃত কথাবার্ত্তা আর করুণা-মিশ্রিত কথা গায়ে মাখে না। ওদের সঙ্গে বাজার করে, দরজির দোকানে যায়, প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনে আনে। সহজভাবে গল্পে যোগ দেয়।

সদাশয় ভাবে মনীশ বলে, 'আমি ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে এসে তোকে পাঠাতে বাবাকে বল্‌ব।'

প্রবীর বলে, 'আর এক উপায় করাও যায়, সেদিন শুনছিলাম ঐ প্রবোধ মুখুয্যেদের একটা কালো মেয়ে আছে, তারা নাকি জামাইকে মানুষ করে দেবে। যা চায় তাই দেবে। সেদিন বাবা বলছিলেন, ওসব সুন্দর মেয়ে লেখাপড়া জানা মেয়ের রোমান্স রেখে ভবিষ্যতের জন্য নিতের, নলের ঐ রকম মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া উচিত।' বাবার ভাষাই ব্যবহার করলে সেও।

নীতিশের মুখ লাল হয়ে উঠ্‌ল, কি যেন জবাব মুখে এলো কিন্তু কিছু বল্লে না।

মনীশের ভাই সুধীশ একটু অবাক হয়ে সকলের দিকে চাইলো, তারপর বল্লে, 'বিয়ের নির্বাচনটা অন্তত নিতুদার নিজের থাক।' সে নীতিশকে অত্যন্ত ভালবাসত এবং এও জেনেছিল, যে সুমিত্রা ঊর্মিলা, মনীশ প্রবীরের জন্য বাক্‌দত্তা হয়েছে। কয়েক দিন আগেও তাদের একজন নীতিশের জন্যই ছিল।

এবং নীতিশ আর এ-বাড়ীর এ সম্পদের কেউ নয় ঘটনাচক্রে। সে নলিনের মতই প্রসাদজীবি।

ছোট বেলার লাঞ্ছনা অপমান আঘাত বারবার ফিরে ফিরে এসেছে এক এক বার এক এক রূপে। কোনোটার সঙ্গে কোনোটা মেলে না। ছেলেবেলায় যেটা ক্ষীরের বাটী, মাংসের হাড়, মিস্টান্নের বা মৎস্যের স্থূলতা বা আকার নিয়ে মনে হয়েছে, পরে আর সে দুঃখ মনে থাকেনি। গাড়িতে ওঠার, পাশে না বসতে পাওয়ার লাঞ্ছনাও আর পরে মনে থাকেনি। তারপর এলো নকল গুরুগৃহ বাসের যুগ। সে যুগের অকারণ অবমাননা বালক কিশোর মনে কম আঘাত করেনি। মাতৃহীন পিতৃহীন বালক বিমূঢ় ভাবে বিমনা ভাবে ঘুরে বেড়িয়েছে, কোনো কূলে তার টলমলে মন আশ্রয় পায়নি। এই সময় থেকেই জ্ঞান যুগের স্মুরু।

শুধু সেদিন অবধি নীতিশের জানা ছিল না সে একেবারে নিঃস্ব, দীন। এই বিষয়টা যেন তার এ-বাড়ীর সম্বন্ধের শিকড়-টাকেও উৎপাটিত করে দিয়েছে। মনের ভিতরের সমস্ত কোমলতা মধুরতা সহসা যেন পাথরের মত হয়ে গেল।

অকস্মাৎ যেন সে জানতে পারল সে কেউ নয়, কোনো সম্পর্কের দাবী নেই, কোন অধিকার নেই এবং কোনো বন্ধনও নেই। কেউ তার শুভাশুভের কথা ভাবে না। ভাববার প্রয়োজন আছে মনে করে না। গৃহপালিত জীবের মত শুধু আহার আশ্রয় দিয়েছে মাত্র।

সেদিন রাত্রের পাঁউরুটীর কমের কথার ঘটনার পর সে যেন আরো বুঝতে পারল নলিন বুলু টুলুদের মতই সে। হয়ত আরো খারাপ অবস্থা—ওরা একদিন এবাড়ী থেকে সহজেই চলে যাবে নিজের পরিজনদের মধ্যে। আর ও?—ও কোথায় যাবে? কার কাছে?

এরপরই সে আকস্মিক ভাবে একেবারে আত্মস্থ হয়ে গেল যেন। তার কথা, তার তর্ক, তার আশা, আনন্দ, কল্পনা, একেবারে নিঃস্ব নিরাশ্রয় হয়ে গেছে, যেন জীবনের পথ হারিয়ে ফেলেছে। কোনো কালো মেয়ের প্রতি তার ঘৃণা ছিলনা, সে জানে, বড় লোকের কালো মেয়ের স্থানও তার চেয়ে অনেক উর্দ্ধে। কিন্তু তার মন, তার ভবিষ্যৎ, সেটা তো তার নিজেরই। সেটা গুরুজনের আলোচনীয়ও নয় অপরের কাছে; তার কাছে বলা যেত। তাতো বলেননি। মেজ জ্যেঠা মহাশয়রা খরচ করতে পারবেন না স্বাভাবিক। কিন্তু?—তাঁদের মুখে? নীতিশের কান গরম হয়ে যায়। বহু কষ্টার্জিত অপমান সহিষ্ণু সৌজন্যময় হাসি যেন ঠোঁটের প্রান্তে আড়ষ্ট হয়ে যায়।

মনীশ হঠাৎ একটু উদার হয়ে উঠেছে, সে বল্লে, 'হ্যাঁ, বিয়ে ব্যাপার সে নিতে নিজে বুঝবে। কারণ বিয়ে করবে যাকে খাওয়াতে পারে কিনা দেখুক।'

সান্ত্বনা দিতে গিয়ে মনীশ আবার একটা কথার আঘাত দিল।

এবারে নীতিশ সহজভাবে হেসে বল্লে, 'হ্যাঁ সত্যি কথাই তো। তা তোমাদের কি আর বাজার বাকি, চল যাই।'

মনীশ প্রবীর সুধীশ সকলে বেশ খুসী হয়ে উঠল যেন, নীতিশের এত সহজ হওয়াতে। সুধীশ ভাবে, তবে কি নিতুদার আর সেরকম মনোভাব নেই? অপমান লাগে না অপ্রস্তুত হয় না? সুধীশ সন্দিগ্ধভাবে নীতিশের পানে চায়।

যাই হোক কয়েক দিনের মধ্যেই যাত্রার দিন এসে পড়ল।

মায়েরা দিলেন দেবতার নির্মাল্য প্রসাদ, আর প্রচুর স্থায়ী অস্থায়ী আহার্য্য—পথের ও পরের। পিতারা বিমনাভাবে স্টেশনে গিয়ে দাঁড়ালেন, পুত্র গর্বে গর্বিত আবার শঙ্কা আকাঙ্ক্ষায় বিচলিত ভাবে।

বন্ধুরা নিয়ে এলো ফুলের মালা, নানাবিধ প্রয়োজনীয় ছোট-খাটো জিনিষ।

সুমিত্রাদের বাবাও এসেছিলেন দুই কন্যা নিয়ে। এবারে দূর থেকে ঘনিষ্ঠতর ভাবে জানা হোক, চিঠিপত্রও লিখতে দেওয়া যেতে পারে।

মনীশের বড় ভাই সতীশ, আরো বহু জনের, স্বজনের মধ্যে নলিন নীতিশ প্রতুলও দাঁড়িয়ে ছিল।

সহসা সুমিত্রার বাবার দৃষ্টি পড়ল সেদিকে। তিনি না দেখার মত মনীশের গাড়ীর জানলায় দাঁড়ালেন।

মনীশ প্রবীর নেমে এলো বন্ধুদের মাঝে, নীতিশ প্রতুল নলিনও পাশাপাশি ওদের কাছে দাঁড়াল।

সহসা যেন জ্যেঠারাও অপ্রতিভ হয়ে গেলেন। নীতিশ কি ক্ষুণ্ণ হয়েছে? তাতো মনে হয় না। তা ওঁরা আর কি করে ওর জন্য এত খরচ করতে পারেন! বুদ্ধিমান ছেলে ক্ষুণ্ণ নিশ্চয় হবে না। যাক্‌, দেখা যাবে। বড় জ্যেঠা বল্লেন মেজকে, 'ওকে একটা ভাল চাকরী করে দিতে হবে।'

মেজ বল্লেন, 'হ্যাঁ। কিন্তু ও আজ এলো কেন বলত?' গিরীশ কিছু বল্লেন না, তাঁর যেন কেমন সঙ্কোচ হচ্ছিল।

মনীশ প্রবীরও যেন কোন্‌খানে নিজেদের অপরাধী মনে করছিল।

উর্মিলা একটি দুটি কথা নীতিশের সঙ্গে কইল। সুমিত্রা নীরবে অন্যত্র চেয়ে রইল। সহসা গাড়ীর বাঁশী বেজে ওঠায় সকলে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

স্কুলের গরমের বন্ধ তখনও হয়নি। বুলু টুলু বেলা ইলা প্রায় সকলেই কাছাকাছি ক্লাসে রয়েছে, ম্যাট্রিক ক্লাসের, সেকেণ্ড ক্লাসের ছাত্রী।

নলিন নীতিশ এম-এস-সি পড়তে ঢুকেছে—সিক্স্‌থ ইয়ার প্রায় শেষ। ওখানে মনীশের ব্যারিস্টারীর একবার হয়েছে পরীক্ষা, একবার দেয়নি। প্রবীর বেশ পড়ছে নিয়মমত।

পাশাপাশি পড়ার ঘরে কারুর বা মাস্টার এসেছে কারো বা নিজেই পড়ছে।

বুলু এসে দাঁড়াল ভাইদের কাছে, মামাদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে।

পড়া শেষ হলে ,বল্লে, 'জানো নিতুমামা, আজকে ভারি অপ্রস্তুত হয়েছি।'

'কেন কিসে ?' নীতিশ বই থেকে মুখ না তুলেই জিজ্ঞাসা করলে।

'আজকে আমাদের ইংরেজী পড়াবার সময় মিস্ হোপ জিজ্ঞেস করলেন, 'জালিয়ানওয়ালাবাগে যে ঘটনা ঘটেছে সে বিষয়ে তোমাদের কি মনে হয় ?' জালিয়ানওয়ালাবাগ কোথায় তাই জানিনা ! তা তার ঘটনা। অবাক হয়ে চুপ করে রইলাম। মেম অবাক হয়ে বল্লেন, 'তোমরা জানোনা কিছু ?' হঠাৎ দেখি প্রবোধ মুখুয্যের সেই কালো মেয়েটা উঠে দাঁড়িয়েছে। মেম তার দিকে তাকালেন। সে একটু থমকে গেল' তারপর বল্লে, 'যদি সত্য হয়, আমার বাবা বলেছিলেন, এই ঘটনা ব্রিটিশ ভারতের বিশ্রী কলঙ্ক।'

মেমের মুখ কাল হয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি জানো সব ঘটনা ?'

বীণা বল্লে, 'হ্যাঁ, আমি যেটুকু কাগজে পড়েছি জানি।'

নীতিশ গল্পের আরম্ভেই মুখ তুলেছিল নলিন সুধাংশু প্রবীরের ভাই সুবীর গল্পের গন্ধে সকলে এসে দাঁড়িয়েছিল। টুলু বেলা ইলাও এলো

নলিন শুধু বল্লে, 'মেয়েটা তো খুব খোঁজ খবর রাখে।'

নীতিশ বল্লে, 'তোরা বুঝি কিছু পড়িস্ না ? খবরের কাগজও না মাসিক পত্রও না ? প্রবাসীতেও কিছু দেখিস না।'

একটু হেসে সুধীশ বলে, 'হ্যাঁ পড়ে বই কি, শুধু গল্প।'

নীতিশও হাঁসলে, এবারে বল্লে, 'পড়ে তো! তা যাই পড়ুক।'

নলিন বল্লে, 'মেম বীণার কথার জবাবে কি বল্লেন ?'

বুলু বল্লে, 'আর কিছু বল্লেন না। আমাদের ক্লাস শেষ হলে আমরা বীণাকে জিজ্ঞাসা করলাম সব। মেয়েটা অনেক খবর জানে, খুব পড়ে। আমরা তার কাছে মুখ্খু।'

ইলা এতক্ষণ চুপ করে ছিল। সে বল্লে, 'কালো মেয়েগুলো একটু পড়া শুনা বেশীই করে।'

নলিন অবাক হয়ে তার দিকে চাইল। তারপরেই তার টুলুর দিকে চোখ পড়ল।

সুধীশ একটু বিরক্ত ভাবে বল্লে, 'তার কি মানে!' তারও টুলুর দিকে চোখ পড়েছিল। টুলুও যেন অভ্যস্ত ভাবে চুপ করে ওদের দিকে চেয়েছিল।

একটু চুপ করে সুধীশ বল্লে, 'কালো রং হ'লে পড়া-শোনা করলেও গায়ে কালো দাগই লেগে থাকে। জালিয়ান-ওয়ালাবাগে যাদের সাদারা মেরেছে তাদেরও রং কালো বলেই মেরেছে।'

এক মুহূর্তে ঘরের হাওয়া তিক্ত হয়ে গেল। সকলেই চোখ নামিয়ে নিলে। কালো মেয়ে টুলু না থাকলে হয়তো কথা বলা

যেত, হয়ত তক বিতক হ'ত, কিম্বা ইলাকে অপ্রতিভ করা যেত। এখন আর কোনো কথাই কারুর মুখে এলো না। ভারতবর্ষের কোটী কোটী কালো মেয়ে যেন টুলুর চোখ দিয়ে ওদের পানে চেয়ে রইল।

জালিয়ানওয়ালাবাগের কালে ভারতবাসী, প্রবোধ মুখুয্যের অবজ্ঞাত কালো মেয়েটা আর নিজের বঞ্চিত অন্তরাত্মায় 'নিত্য চিত্ত ক্ষোভ' সব যেন একসঙ্গে মিশে গিয়ে নীতিশের মনের কোন কোনে বাসা বেঁধে নিল।

কালো মেয়েকে কালো বল্‌লে তার সহসা মনে হয় সে যেন টুলুর মত দেখতে সেই মেয়েটাকে দেখতে পাচ্ছে। আর সে শুধু একলা নয়, তার সঙ্গে অসংখ্য কালো মুখ মিশে গেছে। আর যে দেশ দেখেনি সে দেশের অধিবাসী-অধিবাসিনীর সেই হত্যার কাহিনীও সমস্ত পড়া থেকে একটা রূপ নিয়ে তার নের মাঝে জেগে উঠতে চায়, যদিও রূপ ফোটে না।

কিন্তু নিজের সমস্ত চিত্তক্ষোভ হঠাৎ অনেকখানি, বহু ।স্তৃত অনেক গভীর স্থান পেল যেন মনের কোন্ অজানা চেনা অদ্ভুত অস্পষ্ট লোকে।

বহুদিন ধরে যে অসহায়তা, যে গ্লানি, যে অভিমান শাভ নীতিশের মনে জমে উঠেছিল, কিছু-বা তার জ্ঞাতসারে, ছু-বা অজ্ঞাতে—যা সহসা প্রতিহত হয়ে গিয়েছিল স্বজন রুজনদের ব্যবহারে, হতবুদ্ধি হয়ে আত্মস্থ হয়ে গিয়েছিল— ।' আজ যেন অসংখ্য লাঞ্ছিতের মাঝে নিজেকে দেখতে

পেল। নীতিশ ভাবে, এই কি আমি 'বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই বঞ্চিত করে—বাঁচালে মোরে' কিম্বা এই কি 'বঞ্চিতের নিত্য চিত্ত ক্ষোভ'। নীতিশের চোখের সুমুখ থেকে যেন তার বাইশ বছর বয়স নিজের রাত্রি দিনের সীমানা অতিক্রম করে কত দূরে চলে যায়। সমবয়স্ক সমস্ত বন্ধুবান্ধব যেন তার কাছে সহসা অনেক ছোট বয়স মনে হয়। বহুদিনের আঘাতের ছোট ছোট কথা, অবমাননার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইতিহাস তার অগোচর মনের কোনখানে জমেছিল ওর তা জানা ছিলনা, এখন যেন সহসা তারা তার মনের গোচর জগতে উঁকি মারে, অস্পষ্টভাবে কত কি বলে যায়। যেন মনে হয় কেউ নেই তার, কেউ ছিলনা কখনো। ঐ ফুটপাতে শোওয়া মুটেমজুর ভিখারি দীনদুঃস্থ ওরাও যে স্তরের সেও ঐ স্তরের। অট্টালিকাবাসী সুখাদ্যপুষ্ট উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত তার স্বজনদের যেন আজ আর আপনার মনে হয় না। কোথায় যেন বিরাট ব্যবধান আছে, সেটা শুধু কৃপারই নয় কি?

আর হাতের কাছে আপনি মন সংগ্রহ করে কোথা হতে হাণ্টার কমিটির রিপোর্ট, রাউলাট কমিটির ইতিহাস। আর সঙ্গে সঙ্গে নতুন স্কীমের কত ভালো ভালো চাকরী সংগ্রহের আশার কথা ও বিবরণীসহ বাড়ীতে গুরুজনদের হাত থেকে ওদের ঘরে এসে পড়ে। এবং তারি সঙ্গে মন্থরগতিতে বছর ঘুরে যেতে থাকে। সহসা ডাক আসে জ্যেঠামশায়দের ঘরে বৈঠকখানায়।

বড় জ্যেঠামশাই বল্‌লেন, 'শুনলাম তোমরা নাকি কলেজ যাচ্ছ না, ইউনিভার্সিটি যাচ্ছ না ?'

ছাত্রদল, নলিন নীতিশ সুধীশ আর দলের অন্য সবাই চুপ করে রইল। 'বড়রা তোমাদের অবশ্য না গেলে, কোন ক্ষতি নাই। কেননা এবার তো তোমাদের কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় পাঠাব, তার জন্যে তৈরী হয়ে নাও ভালো করে।' নলিনের দিকে চেয়ে তারপর বল্‌লেন, 'কি রকম তৈরী হবে মনে হচ্ছে ? সাবডেপুটীগিরি জুটিয়ে নিতে পারবে তো ? আর তুমি ? নিতু, কি করবে ?'

এ বাড়ীর বড়রা যখন বড় ছেলেদের সঙ্গে কথা ক'ন কদাচ 'তুই' বলে স্নেহমধুরস্বরে কথা বলেন। বেশ·যেন দূরত্ব রেখে 'তুমি' বলে সম্বোধন করে কথা ক'ন।

নীতিশ বল্‌লে, 'আমি রিসার্চ্চ করছি, সেটাই করি ও সব পরীক্ষা আমি আর দোব না'।

মেজজ্যাঠা হরিশ খবরের কাগজ পড়ছিলেন অর্থাৎ মুখের সামনে কাগজখানা ছিল। তিনি সেটা রাখলেন, বল্‌লেন, 'ও তুমিই বুঝি নন্‌কোঅপারেশন্‌-এ মেতেছ ? আজকালকার দিনে নতুন স্কীমের সরকারী চাকরী আর কম্পিটিটিভ পরীক্ষার দাম কত জানো ? স্বদেশউদ্ধার তোমার দ্বারা না হলেও চলবে ! আগে·নিজেকে সামলাও। খাবে কি ? চাকরী যদি না কর ? চিরকাল জ্যেঠারা খাওয়াবে না।'

গুরুজনের কথার ওপর কথা বলা অভ্যাস নেই। কিন্তু

নীতিশের নলিনের সুধীশের মুখ লাল হয়ে উঠল সমবেত অপমানে। কাকে বলা হ'ল আর কে-বা বাদ গেল তা বোঝা গেল না।

মধ্যম ভাইয়ের মত কটু কথা স্পষ্ট করে বলতে অনভ্যস্ত গিরীশ বল্‌লেন এবারে, 'আর নলিন কি ভেবেছে তার মা বোন আর পিসির ভাবনা চিরকাল আমি ভাবব? সেও কি নন্‌কোঅপারেশন্‌ করছে নাকি?'

ওদিকে বসেছিলেন গিরীশের বড় ছেলে মনীশের দাদা সতীশ, একটু হেসে তিনি বল্‌লেন, 'আর তোমরা পরীক্ষা দেবে না নন্‌কোঅপারেশন্‌ করে বসে থাকবে। ওদিকে সকলেই সব করবে, সরকারী কাজও করবে, তোমরাই বোকা বনে যাবে।'

সমবেত গুরুজনেরা ঈষৎ হাসলেন।

এবারে গিরীশ বল্‌লেন, 'তোমরা তৈরী হও সব ভাল করে। ওসব হুজুগ আমার বাড়ীতে হয় আমি পছন্দ করি না।'

নলিন নীতিশ সুধীশ নত মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। নলিনের মা আছে, বোন আছে—আর টুলু আছে। ও কি সে কথা ভুলে গিয়েছিল? এক মুহূর্ত্তেই একটি কথাতেই সে সমস্ত দেখতে পেল যেন স্পষ্ট করে। অনাথ অন্নহীন আশ্রয়-হীনের আবার মতামত কি? নীতিশের চোখের সামনে যেন তার ভেসে আসে অসংখ্য নিরীহ দীন লাঞ্ছিত বঞ্চিত দেশ-বাসীর মুখ, যারা বারবার উৎপীড়িত হয়েছে, যাদের অনাহারে

মৃত্যু হয়েছে, যাদের নিরস্ত্র মরতে হয়েছে প্রবলের হাতে, যাদের ওপর কোনো অত্যাচারের কখনো প্রতিকার হয়নি, হয়ত কোনো দিন হবে না। আর তারাও কি তাদেরই একজন নয়? শুধু অভিজাত ঘরের সম্পর্কীয় মাত্র!

যাই হোক, উপরওয়ালার হুকুম বা গুরুজনের আদেশ। যন্ত্রের মত ওদের স্নান হয়ে গেল। কলেজের বেলা হয়েছে খেতে গেল ভিতরে।

নানাবিধ মন্তব্য ও শ্লেষ উপদেশের কণিকা অন্তঃপুরেও ছড়িয়ে গিয়েছিল। কোঅপারেট পুত্রকে দেখে রমা আশ্বস্ত হলেন। বুলু টুলুরও কলেজের বেলা হয়েছিল। যাবে কিনা স্থির করতে পারছিল না।

উপর থেকে শোনা গেল নলিনের বড় মামার গলা 'তোমরাও বুঝি নন্‌কোঅপারেশন্ করছ? তা ভালো। তা আর একেবারেই যেও না। পড়ে শুনে যা সব শ্রী হচ্ছে? কালো, কোলকুঁজো, মুখের হাড় বের করা! ছেড়ে দাও পড়াশোনা। নইলেও রূপ দেখলে জন্মে কেউ বিয়ে করবে না।'

বুলুর মুখ আরক্ত হয়ে উঠ্‌ল। সে 'কোলকুঁজো' 'কালো' নয় বটে, কিন্তু টুলু যে কালো আর রোগা, মুখের হনুর হাড় উঁচু। টুলুর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। বুলুর মনে হল যেন এর চেয়ে ওরা বুলুকে দুটো অপমানের কথা বল্‌লেন না কেন। কলেজের কাপড় পরে তারা নিঃশব্দে নেবে এলো। রমার কানেও সব কথা পৌঁছল কিন্তু সকলেই নির্বাক হয়ে রইল।

নীতিশের মনে হল সাদার কাছে, গোরার কাছে, স্বাধীনের কাছে পরাধীন অন্নহীন আশ্রয়হীন কালোর লাঞ্ছনা কি এরো চেয়ে বেশী হয়? না হয় তারা কখনো কখনো গুলি মারে, বেত মারে। এদের সঙ্গে তো আমাদের রক্ত সম্পর্ক আছে, দেশের সম্বন্ধ আছে, চিরকালের একত্রবাসের সম্বন্ধ রয়েছে; তবু কি ওদের চেয়ে এদের ঘৃণা এই নিঃস্ব দীন দরিদ্রের ওপর কম?

অনেকদিন আগে তাদের আভিজাত্যের বিচারের অহঙ্কৃত তর্ক করার কথা মনে হয়। যে দিন তাদের মনে ছিল তারা অভিজাত, তারা শিক্ষিত, তাদের রুচি সাধারণের চেয়ে উন্নতস্তরের এবং তাই নিয়ে তাদের গর্ব্ব গৌরব আর আলোচনার শেষ ছিল না।

আজ মনে হয় তার, আভিজাত্য বা অভিজাত যাকে তারা বলে, তাদের অহঙ্কারের সীমা নেই। তাদের রুচির অহঙ্কার, সৌজন্যের অহঙ্কার, শিক্ষার গর্ব্ব, সংস্কৃতির গৌরব সবই তাদের কারুর সঙ্গে মেলে না। তাই জনসাধারণ তাদের অবজ্ঞার পাত্র, অশিক্ষিত অথবা দরিদ্র স্বজন করুণার পাত্র এবং শিক্ষিত স্বজন প্রতিদ্বন্দিতার পাত্র। তাদের অভিজাত-মনে মমতা নাই, প্রেম নাই, কোনো ত্যাগস্বীকার নেই, শুধু আছে অপরিমেয় অহঙ্কার! তাকে দুঃখেসুখে প্রেমে করুণায় সকলের সঙ্গে এক করে নিয়ে একত্র বসা যায় না। এক কথায়, সে তার অহঙ্কারকে নিয়ে সর্ব্বত্যাগী

হয়েছে। তার বিলাস, তার আনন্দ, তার লীলা শুধু নিজেকে নিয়ে। তাই তারা অনায়াসে মানুষকে ঘৃণা করে ও করুণা করে। এই অভিজাত মানে অহঙ্কারের যার সীমা হয়না। প্রেমহীন নিষ্ঠুর অহঙ্কার।

কিন্তু এমনি কঠোর অভিজাত মনের অহঙ্কৃত গড়ন তাদেরও, যে তারাও নতমুখে নিঃশব্দে প্রত্যহের মতই ডাল-ভাত মেখে খেয়ে উঠে গেল। টুলুর চোখে এক ফোঁটাও জল পড়লনা, নলিন নীতিশের মুখের একটি রেখাও কুঞ্চিত হ'লনা।

শুধু মনে মনে নলিনের স্থির হয়ে গেল যে, পরীক্ষা দেবে, আর পাশ করবে, আর যে চাকরী বলবেন বা পাবে তাই করবে।

কয়েক দিন পরে যখন সুধীশ জিজ্ঞাসা করলে 'নলিন কি পড়ছিস ভাই? পরীক্ষা দিবি নাকি চাকরীর?'

নলিন শান্তভাবে বল্‌লে' 'হ্যাঁ ভাই, চাকরীই করব ভাবছি, তাই ভালো করেই পড়া ভালো।'

আভিজাত্যের ছোঁয়াচ লাগা যদি গর্ব থাকে তা ওদের মনে ছিল, যা কারো সহায়তা চায়না, সমবেদনা নিতে সঙ্কোচ বোধ করে, আপনার দুঃখের কথা বলতে চায়না কারুকে। আর শামুকের মত এক শক্ত খোলায় সমস্ত অন্তর আবৃত করে রেখেছিল তাদেরও।

(৫)

প্রতুল দেশে নেই। নলিন পড়ার সমুদ্রে আকণ্ঠ ডুবিয়ে রেখেছে, পাশ তাকে করতেই হ'বে। এবং চাকরী। যে কোনো চাকরী, সংসার প্রতিপালনের মূল্য পেলেই হবে। লেখাপড়ার বা অন্য আদর্শের কোনো কথা তাদের জন্য নয়। তাকে অন্ন সংগ্রহ করে পরিবারের মুখে দিতে হবে। নলিন যেন কোথায় নিজেকে লুকিয়ে ফেলেছে, অতি ভদ্র শান্ত মুখে অন্ন ও উপদেশ গলাধঃকরণ করে। আগেকার টেনিস র‍্যাকেটধারী দেশী ও বিদেশী আধুনিক সাহিত্যের মলাট এবং বিক্ষিপ্ত পত্র আলোচনাকারী, সাহিত্যিক নামাবলী মুখস্ত করা বন্ধুর দল, যখন নীতিশ বড়লোকের ছেলে ছিল, অর্থাৎ উত্তরাধিকারত্ব পাবার আশা ও আভাস ছিল তারা আপনিই কি রকম করে নীতিশের নলিনের কাছ থেকে সরে গেছে।

অভিজাত নামাধেয়দের কাছে নলিন নীতিশ সমান অপাংক্তেয়।

নীতিশের নিজের চোখে পড়ে সে একেবারে একা যেন। আর শুধু সে নয়, এই মস্ত বড় একান্নবর্ত্তী পরিবারের শিশুর দল, বালকের দল, কি অদ্ভুত একটা আভিজাত্যের নিষ্ঠুর সঙ্কেতে একেবারে একা। ঐ বাড়ীর আশ্রিতদের শিশুরা চেঁচিয়ে কাঁদে না, বড়রা বকেন। খায় তারা মাথা নিচু করে, খেলা তারা

চেঁচিয়ে করে না, উচ্ছ্বাস তাদের নেই। উৎসব আনন্দ তাদের এমন সংযত যেন ড্রিল করতে দাঁড়িয়েছে। আভিজাত্য বোধহীন অন্য বালক-বালিকারা আশ্রিতদের সঙ্গে থেকে ঠিক ঐভাবেই সংযত-ভীত হয়ে গেছে।

সেই অদ্ভুত জগতে দু'একজন যারা ভাগ্যবান তারা মা বাপের ঘরে শোয় এবং মার হাতে খাবার পায়। অন্য সকলে মা বাপ থাকলেও বিচ্ছিন্নভাবে ঘুরে বেড়ায়, খেলা করে, পড়ে।

তারি মাঝে সহসা কেমন করে ছোট ছোট বন্ধুর দল গড়ে উঠেছে। ধনী দরিদ্রের ভেদহীন পরম মমতায় তারা পরস্পরকে আপনার করে নিয়েছে।

সুধীশ বড় কর্তার ছোট ছেলে কেমন করে এই আশ্রিত অনাথ বুলু টুলু নলিন নীতিশদের দলে আশ্রয় নিল। তার ঢিলা প্রকৃতির জননী তাদের লালন করেছেন শিশুকালে, কিন্তু পালন করতে পারেননি, কাজের, কর্তব্যের ও সেকালের বধূ-ধর্ম্মের খ্যাতির পরম মোহে ঐ বিরাট সংসার যাত্রার ভাঁড়ার ঘরের সীমানা ছাড়িয়ে আর বেরিয়ে কোনোদিক দেখেননি। ফলে ছোট ছোট ছেলেরা বড় ভাইদের কাছে চাণক্যের 'তাড়য়েৎ দশ বর্ষাণি' নীতি সম্পূর্ণ পাঁচ বছর ভোগ করেছে অথচ পরেও 'মিত্রবৎ' আচরণ পায়নি।

অর্থাৎ ও বাড়ীতে সেকেলে শিক্ষাও ছিল, আধুনিক দূরত্ব রাখার সভ্যতাও এসেছিল।

সুধীশ সকলের কাছে তাড়া খেয়ে দিদি আর দিদির ছেলে-মেয়ের দলে মিশে গেল।

হেনকালে আকস্মিক কি অসুখে নীতিশের পিতামহীর মৃত্যু হ'ল।

দিনান্তে বা সপ্তাহান্তে সকলের একটা ঘরে একবার জড় হওয়ার উপলক্ষ যে জননী ছিলেন ; যে ঘরে সেকালের মত রূপকথা শোনা বালকবালিকা, কিশোরবয়স্ক ছেলেমেয়েরা ও কর্ম্মনিরত বা শাশুড়ীর আদেশ উপদেশজিজ্ঞাসু বধূরা মাঝে মাঝে জড় হতেন ; সেই সন্ধ্যা মধ্যাহ্নের মিলনের, সহজ গল্প ও আলাপের 'দেশকাল ও পাত্র' যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে ভোজ-বাজির মত মিলিয়ে গেল। ছোট ছোট কেন্দ্রে তারা হয়ত বন্যার ডোবা চরের মত অন্যদিকে জেগে উঠল। কে জানে সে কথা!

আর ঠাকুমার ঘরটা যেন কার ভাগে পড়ে গেল। এবং নীতিশের মনে হ'ল, ঠিক যেন এই সময়েই এইটা দরকার ছিল, এমনভাবেই সমস্ত সংসার-যাত্রাটা সেই মানুষটাকে একেবারে নির্বিকার হয়ে বিস্মৃত হয়ে গেল।

আর বাড়ীর সমস্ত কিশোর ছেলেরা যারা রবীন্দ্রনাথের 'ছুটী' গল্পের ফটিকের মত সেই বয়সের কিছু উর্দ্ধে বা কমে, আসলে অবস্থা একই প্রায়—শুধু পড়ার ঘরেই আশ্রয় পেল। গোঁড়া অভিজাত-বুদ্ধিহীন সেকেলে নির্ব্বোধ পিতামহীর সেকালের কথা বলা, রূপকথা বলা, পুরাণের গল্প বলা আসর আর বাড়ীতে কোনোখানে নেই।

নীতিশের নতুন অভিজ্ঞতা হ'ল এই মৃত্যুর পর। পিতা-মাতার মৃত্যুর সময় সে ছিল বালক, সেদিনের বাড়ীর কোনো কিছুই তার মনে খুব স্পষ্ট ছিল না। আজকে ঘাত-প্রতিঘাত আশা-নিরাশায় জগত তার কাছে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে চারদিকে। যেন প্রতি মুহূর্তে বাড়ীর আবহাওয়া নিঃশব্দ ইঙ্গিতে জানিয়ে দেয়—কোথায় কার সীমানা, কোথায় মাত্রা লঙ্ঘন হ'ল কার!

আশ্রিত দলের অধিকারহীন সকলের অন্তর যেন চকিত হয়ে থাকে ত্রস্তভাবে, কোনদিন 'মুক্তি' মেলে—'অপমানের ঢাকে ঢোলে বাজি'।

হেনকালে প্রতুলের চিঠি এলো কিষণগড় থেকে। সে সেখানকার একটা কাপড়ের মিলে উইভিং মাস্টার হয়ে গেছে। লিখেছে, 'এখানে যে রকম গরম তাকে অসহ্য গরম বলা যায়। ভোর পাঁচটায় সূর্য্যোদয় আর রাত্রি আটটায়ও সন্ধ্যার আলো থাকে। একবার এই পনের ঘণ্টা দিনের ও প্রচুর ধূলো ও মাছির দেশ দেখে যা। বাংলা দেশের ছেলে হলেও মন্দ লাগবে না। তুই এলে তখন না হয় আরো একটু দীর্ঘ দিনের দেশে গিয়ে জালিয়ানওয়ালাবাগটা দেখে আসব।'

পনের ঘণ্টা দিনের দেশে সূর্য্য তখনো অস্ত যায়নি। নীতিশ পৌঁছল পাথরের তৈরী ছোট স্টেশনে।

পানের পিক ফেলার দাগ, ধুলোয় ধুসরিত লম্বা প্ল্যাট্ফরমে প্রতুল দাঁড়িয়ে আছে দশ বছরের ছোট বোনের হাত ধরে।

উদ্ভাসিত আনন্দে থার্ডক্লাসের যাত্রী, অপরিচ্ছন্নবেশী নীতিশের ধুলায় ধূসর মুখ ভরে গেল। ট্রেন ভ্রমণের তৃতীয় দিন যেন আর কাটছিল না। সাদা তুলোর গুঁড়ো ভরা সুতার কুটো লাগা মিল থেকে সদ্য প্রত্যাগত প্রতুলেরও মুখ হাসিতে বিভাসিত হয়ে উঠল।

দূরে দূরে নীলরংয়ের পাহাড় শ্রেণী—অদ্ভুত রকমের অসমতল পথ দিয়ে টাঙ্গা চলেছে, আগের পথিক গাড়ীখানা যেন গড়ানে পথে দূরে একেবারে মিলিয়ে যাচ্ছে, আবার উঁচু পথে উঠছে দেখা যাচ্ছে।

সহরের তিনদিকে পাহাড়ের সারি। পাহাড়ের কোলে ছোট ছোট গ্রাম, দূরে দূরে ভুট্টা বাজরা যবের ক্ষেত ; প্রকাণ্ড কূয়ো—বলদে জল টানা।

আর মিলের সামনেই প্রতুলের বাড়ী। ছোট ছোট ভাই বোন দুটি আর মা।

শুকনো দেশ, রৌদ্র ঝলমল ভোর থেকে—আলো ভরা দেশ। সত্যই প্রচুর মাছি ও

প্রতুলের মা বোন ভাইরা কোনোকালেই বড়লোক নয়, নিতান্ত গৃহস্থ পরিবার। বিলাসের প্রয়োজনবোধহীন মন তাঁদের। বহু জিনিষ যা দরকার লাগে নীতিশদের বাড়ীতে মনে করা হয়, তা তাঁদের নেই। জানেনও না হয়ত। দেখেনই নি, অথবা দেখেছেন হয়ত কিন্তু প্রয়োজন বোধ জাগেনি।

ছোট ছোট খান তিনেক ঘর। রান্না ঘর, নিচু আঙিনা মাটীর—সামনে ছোট ছাত। সারাদিন মা কাজ করেন, বোন জননীর সঙ্গে হয়ত কিছু করে—আসন দেওয়া, জল দেওয়া, আলু ছাড়ানো, রুটী বেলা হয়ত!

আর সারাদিন নীতিশের সঙ্গে গল্পের তাদের শেষ নেই।

মিলের মাঝের প্রকাণ্ড পুকুর, মিলের কর্তা সাহেবের প্রকাণ্ড কুকুর, আর দূরের নীল পাহাড়—তার পাথরগুলোর রংয়ের কথা, এই তাদের গল্পের বিষয়। পুকুরের মাঝে সব সময় জলের বুদ্বুদ ওঠে, এটা একটা মস্ত সমস্যা ওদের। ওতে কি মাছ আছে? তাই? অথবা কিষণলাল বলেছিল একটা দৈত্য আছে আর দাদা বলে মিলের জল এসে পড়ে—কোন্‌টা সত্য?

আর মাছ যদি থাকে তো কি হয়? দৈত্য কি খেয়ে ফেলেছে? এখানকার লোকেরা তো মাছ খায় না কিষণলাল বলে।

দাদার কথাটা ওদের বিশ্বাস হয়, কিন্তু কিষণলালের কথাটাও অবিশ্বাস করা যায় না, সে যে বলেছে দৈত্যকে সে দেখেছে।

এবং 'নীল পাহাড়ের এক টুকরা পাথর যদি নীতিশ দাদা এনে দেন। কি চমৎকার নীল রং!'

মিনু আর বিনুর গবেষণার শেষ নেই। মিনতি হল প্রতুলের বোনের নাম, আর বিনয় ছোট ভাইয়ের নাম।

আর মিলের মাঝখানে যেখানে চাকা ঘোরে, প্রকাণ্ড এক-তলা সমান উঁচু চাকা তার কাছে একটা জায়গায় একটা লোহার ডাণ্ডা একবার এদিক আর একবার ওদিকে যায়, তার পাশ দিয়ে দাদা যে কি করে যায়! বিনয়ের তো মনে হয় ওকে এক ধাক্কায় ছিটকে ফেলে দেবে বড় চাকার গর্তয়। ওরা কত বার মাকে বলেছে, যদি দাদাকে ধাক্কা দিয়ে দেয় লোহার ডাণ্ডাটা। দাদা হাসে। দাদা যায়. কিষণলাল ফিরোজখাঁ যায়, সকলেই যায় সেইখান দিয়ে।

মিনু বলে, 'আর জানো নিতুদা. বড় সাহেবের কুকুরটাকে আমরা কি রকম করে পোষ মানিয়েছি?'—

নীতিশ হাসে, বলে, 'কি করে? লজঞ্চুস দিয়ে?' মিনুও হাসে, বলে, 'না, আমরা ভোরবেলা তো দাদার সঙ্গে ঐ গেট অবধি যাই,—ও আসত তেড়ে, আমরা তারপর রোজ ওর জন্যে রুটী নিয়ে যেতাম। মা জানেন না, পাঁউরুটী পকেটে করে নিয়ে যাই। বিনুও নেয় আমিও নিই। আর তারপর আমরা মিলের মধ্যে যাই, ও আর কিছু বলে না।'

প্রতুল সকালে যায়, বারোটায় আসে—খেয়ে আবার যায়, পাঁচটায় ফেরে তুলোয় এবং ধূলোয় আপাদমস্তক ভরে।

তারপর দুই বন্ধুতে সাহেবের কুকুর, পুকুরের বুদ্বুদ আর নীল পাহাড়ের নীল পাথরের গবেষণা হয়। দৈত্যকে ওরা কাছে গিয়ে দেখতে চায় না, তবে এই বাড়ীর জানলা থেকে

মা আর দাদার সঙ্গে দাঁড়িয়ে দেখতে আপত্তি নেই। যায় দেখা? দাদা দেখেছে কি?

ঐ নীল পাহাড়ের নীল পাথরের টুকরার লোভ আর মিন্নুর মন থেকে যায় না।

দাদা বলেছে 'ওরে দূর থেকে ও রকম নীল, কাছে গেলে দেখবি সব ধুলোর মত রং, নয়ত এমনি সব পাথরের মত রং।' দাদা কত পাথর দেখায়। কিন্তু মিন্নুর সংশয় যায় না। তাহলে কাছে গিয়ে দেখবে।

দাদার না হয় সময় নেই, নিতুদা একদিন চলুক না, সেতো হতে পারে', বিন্নু বলে। তাতে মা বলেন, 'ও যে অনেক দূর, ওকি এখানে যে হেঁটে যাওয়া যাবে?'

মা তো যাননি একদিনও কিন্তু কি রকম বলে দেন। দাদাও হাসে, বলে, 'অনেক দূর সত্যিই।'

ওরা শুধু ক্ষেতের ধারে, কূয়োর ধারে, মিলের আশপাশে ঘুরে আসে।

কলকাতার গণ্ডিঘেরা বাড়ী আর নানা দলাদলি, পরোক্ষে অপরোক্ষে অহঙ্কৃত আলোচনা, মন্তব্য, একেবারে শেষ করা নিষ্পত্তি করা মতামত, ভালো মন্দ বিচার লোকের বিরুদ্ধে, সপক্ষে; সমস্তক্ষণ সতর্ক আলাপ—এক কথায় নানা স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের মাঝেও আড়ষ্ট জীবনযাত্রা—এদের ঘরে নেই। নীতিশ ভাবে।

এদের কাছে বসা, গল্প করা যে রকম সহজ, দিদির কাছেই শুধু ও-বাড়ীতে তারা সহজ হতে পেরেছে সে ভাবে।

তবু দিদি আর টুলু বুলু নলিন সেখানে কত শঙ্কিত, সতর্ক। প্রতুলের মা ভাইবোনরা তো তা নন।

প্রতুলকে বলে। প্রতুল হাসে, বলে, তাহলেও তোমরা আর ক'জন! আমরাই তো বেশী। স্টেশনের মিলের কোয়ার্টারে দেখে এসো, সহরের ছোট ছোট বাড়ীতে দেখে এসো। আমরা কতজন! কলকাতায় দেখ্‌তে পাওনি, কেননা চিরদিন এক জায়গায় থেকে গিয়েছিলে। আরো আমাদের দেখলে দেখবে, আমরাই সর্ব্বত্র এইভাবে আছি, আদি ও অকৃত্রিম জীবনযাত্রা করছি।

আর আমরাও সব নয়,—আমাদের পরের স্তরও আছে, যারা পথেঘাটে ক্ষেতে খামারে মাটীর ঘরে একখানি মাত্র ঘরে, দুখানি বা একখানি কাপড়ে রয়েছে। এরা তবু গেরস্ত। আরো পরের স্তরও আছে। কিছুদিন আগে আমি মিল থেকে ফিরছি। এখানে এবারে মোটে যব হয়নি, অন্যবার দু টাকা মণ হয় এবার টাকায় আট সের। এদেশের লোক যব আর বাজরাই বেশী খায়, যবটা বারো মাস চলে, বাজরা আর ভূট্টা শীতের সময় ছাড়া খেতে পারে না, সহ্য হয়না। আমি মিল থেকে ফিরে দেখি বাড়ীর সামনে গান গেয়ে জন কতক মেয়ে ছেলে কোলে ভিক্ষে করছে। মাতো তাদের আটা আর রুটী যা সামান্য সম্ভব দিলেন। শেষরাত্রে ছোট ছেলের

কান্না শুনে চাকরটা উঠ্‌ল, দেখা গেল একটি বছর দেড়েকের ছেলেকে আমাদের সিঁড়ির উপরে বসিয়ে রেখে কারা চলে গেছে। খোঁজাখুঁজি করা গেল সকালে. বাচ্ছাটাকে তো খাবার-টাবার দিয়ে বসিয়ে রাখা গেল কিন্তু মা বা বাপের কোনো পাত্তা পাওয়া গেল না। কেউ বল্লে, কাল যারা এসেছিল তাদের ছেলে, কেউ বল্লে, না অন্য কারুর।

শেষ অবধি একটা অনাথাশ্রমে দিয়ে এলাম। তাও জানো, মিশনারীদের অনাথাশ্রমেই দিতে হল। দেশী তো নেই, থাকলেও নিত কি না সন্দেহ হয়—কেননা মিলের কেউ ছুঁলই না—বলে, কি জাত না জানলে ছোঁব না।

এও একটা স্তর যেখানে আমরা নাবি না, ওরা উঠতে পারে না। তবে তোরা হয়ত আমাদের দশায় নাববি কেউ কেউ, কিন্তু এদের তুলনা হয়না। আমি তো মিলে কাজ করি, কত রকমের যে দুঃখ দেখি—অন্ন বস্ত্র মান অপমান মার ধোর তাড়ানো কি যে দেখিনি তা জানিনা।

আর জানিস্‌ আমরাও কম অত্যাচার করিনা, না জেনেই মুখে বড় বড় কত কথা বলিছি, মনে আছে? কাজের সময় চূড়ান্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করি, ঠিক জীব জন্তুকে যা করা হয়। দুঃখ এই, ওরা বুঝতেও পারে না এতই অপমান হতে অভ্যস্ত!

নীতিশ চুপ করে শোনে, মনে লাগে, 'এতই অপমান হতে অভ্যস্ত!' ওরাও তো! নয় কি?'

৬

মণীশ পাশ করে ফিরছে 'তার' এলো।

বাড়ীতে উৎসবের সূচনা সুরু হল। সঙ্গে সঙ্গে তার বসবার ঘর, যাকে বিলিতী কথায় 'চেম্বার' বলে,—বলছেন সবাই, সাজানো হতে লাগল। ছেলেদের পড়বার ঘর যেটা ছিল সেইটাই মণীশের বসবার ঘর হবে। বিয়ের ঠিকতো ছিলই, এবার বিয়ে হবে, সুমিত্রার বাপও আসা-যাওয়া করতে লাগলেন।

অন্তঃপুরেও ঘরের হিসাব হতে লাগল।

মা মারা গেছেন। ঘর খালি। কিন্তু সেই ঘরে আগে থেকেই রমা রয়েছে—অবশ্য অস্থায়ীভাবে।

হরিশ বল্লেন দাদাকে, 'তুমি মার ঘরে চলে যাও, আর তোমার ঘরটা মণিকে দাও। আজ বাদে কাল প্রবীর আসবে, তার জন্যে থাকার একটা ঘর দরকার—কি যে করি।'

দাদা চিন্তিত ভাবে বল্লেন, 'রমাকে কোথায় দিই?'

হরিশ বল্লেন, 'ওকে নিতের ঘরে দাও, নিতেতো এখন নেই। আর নিতে ওদের ভালবাসে। তা ছাড়া নলের চাকরী হলে তো সে মাকে নিয়ে যাচ্ছে এবার।'

গিরীশ বল্লেন, 'তা নিয়ে যাবে কিন্তু মেয়েটার একটা বিয়ে তো আমার দিতে হবে। আবার টুলিও রয়েছে রমার গলায়।'

হরিশ বল্লেন, 'বুলুর তো তুমি সম্বন্ধ দেখছ—হয়ত সেখানে হয়ে যাবে। টুলির ভাবনা ওদের জ্ঞাত-গুষ্টিরা ভাবুক, রমা তাদের কাছে নিয়ে যাক্।'

রমার বড় ভাই এসে বসেছিলেন, বললেন, 'আচ্ছা, আমি ভাবছিলাম নিতের সঙ্গে টুলির বিয়ে দিয়ে দিলে কেমন হয়?'

হরিশের মুখে একটা সূক্ষ্ম হাসির রেখা ফুটে উঠল, তিনি ভাইয়ের দিকে চেয়ে রইলেন জিজ্ঞাসু চোখে।

গিরীশ বাবু চিন্তিত ভাবে বল্লেন, 'তা মন্দ হয় না কিন্তু নিতু কি রাজী হবে?'

হরিশ বল্লেন, 'কেন হবে না? আর কি ভালো মেয়ে ও পাবে? ওর আছে কি? চাল না চুলো, ওকে মেয়ে যে দেবে ওই রকমই দেবে। তুমি ঠিক করে ফেল মনে মনে। বুলু আর মণির বিয়ে হলেই, ওরও টুলির সঙ্গে দিয়ে দাও। রমা দেশে যায় যাক্, ছেলের কাছেও যেতে পারে।'

নীতিশের আদর প্রশ্রয়আশ্রয়দাত্রী পিতামহী নেই। দীর্ঘকালের সঞ্চিত বিরাগ তাকে নিয়ে সন্তানদের প্রতি-যোগিতার ক্ষেত্রে তার পিতৃব্যদের ও ভাইদের কম ছিল না।

নীতিশের এই পারিবারিক, সামাজিক এবং ভবিষ্যতের উন্নতির ক্ষেত্রে পরাজয়ের সম্ভাবনায় হরিশের আর সতীশের মন যেন প্রসন্ন হয়ে উঠল। যাকে বহুদিন ধরে ছোট করতে চেয়েও করা যায় নি, যে পড়া লেখায় নিজের সন্তানদের চেয়ে ভালো, যার বাপও ওদের পিতৃ-মাতৃ স্নেহের সরিক,

প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, তাঁকে ভালো লাগেনি কোন দিন ভাইদের। তাঁর অকালমৃত্যুও তাদের মনে বিশেষ আঘাত করেনি বরং বৈষয়িক লাভের সম্ভাবনা এনে দিয়েছিল। এখন নীতিশ পিতামহের ভুল বা যে কারণেই হোক সেই সমস্ত জটীল অসুবিধা থেকে ওদের মুক্ত করে দিয়েছে। আরো এখন তার টুলুর সঙ্গে বিবাহ দিলে গিরীশেরও দায়িত্বভার হাল্‌কা হয়। আর যদি সে অসম্মত হয়, তাকে এই সুযোগেই অনায়াসে অকৃতজ্ঞ বলা যাবে,—হয়ত তাকে অপ্রতিভ হয়ে অন্যত্র চলে যেতে হবে।

হরিশ ভাবলেন, তা হলে তখন নীতিশের ঘরের ভাগের অংশটা সকলে ভাগ করে নিলে আর ওঁদের সন্তানদের কোনো অসুবিধা থাকবে না। কেননা ইলার বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে, খুব বড় ঘরের ছেলে। জামাইয়ের জন্য ভাল করে আনা নেওয়ার ব্যবস্থা করা চাই।

পরামর্শ সভা ভঙ্গ হল।

নিজেদের দরকার ও সুবিধা জিনিষটার কাছে সমস্ত বড় বড় কথা হার মানে। ভাইয়েরা খুশি মনে কৃতী পুত্রদের আগমনীর আয়োজনে ব্যস্ত হলেন।

নীতিশ বাড়ী নেই, কোন অসুবিধাই তাতে নেই। যজ্ঞে বলির জন্য পশুর মত নেওয়ার তো প্রয়োজন কখনো দেখা যায় না। বড় বাড়ীর আশ্রিতজন তার চেয়ে উচু স্তরের জীব নয়। আইনতঃ যদি দাবী থাকে তাহলেও দরিদ্র

দীনের কোনো ব্যবস্থাই সহজ হয় না, যে ক্ষেত্রে কোনো দাবী অধিকারই নেই সেখানে শুধু নীতির বা কর্তব্যের মিথ্যা বিবেকের অথবা তুচ্ছ মায়ার দোহাইয়ের কথা মানুষের ভুলে যাওয়াই ভাল মনে হয়। বেশ আশ্বস্তভাবে মানুষ নিজেকে বলে, এর ওপর কারুর কোনো হাত নেই, ওর তো অধিকারই নেই যখন। ভগবান, ভগবানই তো এই সব থেকে ওদের বঞ্চিত করেছেন। নয় কি? নইলে নীতিশের বাপ বেঁচে থাকত। রমার বৈধব্য হত না। টুলি এসে ওদের বাড়ীতে থাকত না। পৃথিবীর ইতিহাস দেখ, তাই কি নয়?

জন্মান্তরের কত পাপ থাকলে তবে তো মানুষ বঞ্চিত হয়। কথায় বলে না,—'দেবতা দিলে ফুরোয় না, মানুষের দেওয়ায় কুলোয় না!' যদিও এসব মেয়েলী কথা, তবু এ সমস্ত কথার দাম আছে, দরকারের সময় ভেবে নেবার জন্য, হয়ত বলবার জন্যও। গুরুজনবর্গ অভিভাবক মণ্ডলীর মনে আর দ্বিধা থাকে না। কিন্তু রমার আনন্দের সীমা রইল না এই প্রস্তাবে। টুলীর এত ভাগ্য হবে! হতে পারে? কি অভাবনীয় অচিন্ত্যনীয় সৌভাগ্য টুলির। অবশ্য নীতিশের দিক থেকে তার মন একটু দুঃখিত হচ্ছিল কিন্তু নীতিশ যে তার আরো আপনার হয়ে যাবে এওতো কম কথা নয়।

ইলা বেলা বুলুর অদ্ভুত ঈর্ষায় মন ভরে গেল। বাড়ীতে নিতুদা বা নিতু মামা অদ্ভুত প্রিয় ছিল। তার গান, তার বাঁশী, তার সুন্দর ব্যবহার, প্রিয়দর্শন, সুদর্শন সে, তাকে

মোহময় মনোহারী করে তুলেছিল সকল ছেলেমেয়ের দলের কাছে।

ইলার বিয়ের ঠিক হয়েছিল খুব বড় ঘরে রূপবান পাত্র দেখে। বেলার বিয়ে হয়নি। কিন্তু ভালই বিয়ে হবে ওরা জানে যেহেতু তারা ধনীর দুহিতা। বুলুর বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে, ভাল হোক আর মাঝারী হোক বিয়ে হবেই। শুধু টুলির কেউ নেই তার বিয়েই হবে না অথবা হবে খুব অবাঞ্ছনীয় পাত্রে। এইটেই যেন জানা ছিল ঠিক ভাবেই। ওদের যেন বিরাগের সীমা রইল না টুলুর ওপর। কারণহীন তিক্ত ঈর্ষায় তারা আশ্চর্য্যভাবে ডুবে গেল।

ওদের কারুর সঙ্গে যে নীতিশের বিয়ে হয় না তাও ওরা জানে। তবু ওদের ভাল লাগল না। টুলি ওদেরই বাড়ীতে বধূরূপে আসবে! আর নিতুদার বৌ হয়ে! অমন ভাল নিতুদার ঐ কালো মেয়েটা বৌ হবে। তার চেয়ে সেই প্রবোধ বাবুর মেয়ে বীণা তার সঙ্গে হোক না। তবু তো বড়লোকের মেয়ে, লেখাপড়াও জানে।

ঈর্ষাতুর ইলা প্রকাশ্যেই বীণার কথা বলে ফেল্‌লে। টুলির এ বাড়ীর বৌ হবার কি যোগ্যতা আছে!

যোগ্যতার কথায় বুলুর পিতৃগর্ব, বংশ গর্ব জেগে উঠল। সে ঝাঁঝের সঙ্গে বল্লে, ‘কেন আমাদের বাবা ঠাকুর্দা তো বড় বংশেরই ছেলে ছিলেন! তাঁরা থাকলে টুলির বিয়ে কি ভালই হ’ত না?’

ইলা বেলার মুখে ব্যঙ্গের হাসির একটা রেখা ফুটে উঠল। অপমানিত বুলুর মনের ঈর্ষার ভাবটা যেন মিলিয়ে গেল অনেকটা। তার মন টুলুর দিকেই আস্তে আস্তে ঝুঁকে পড়ল।

ইলা বল্লে, 'আশ্চর্য্য ভাই কিন্তু ওর ভাগ্যটা। কি আছে ওর? না রূপ, না কোনো পরিচয়। নিতুদা বেচারীর জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে।'

সুধীশ এসে দাঁড়িয়েছিল। নিতুদার জীবনের সমস্ত পথ বাধাগ্রস্ত হয়ে উঠুক বড়দের এই মনোভাব সে দেখেছিল, সেটা তার ভালো লাগেনি। কিন্তু অকস্মাৎ টুলুকে নিয়ে ইলার কথায় সে বিরক্তভাবে বলে উঠল, 'তোমাদেরই সব প্রাপ্য হবে পৃথিবীতে, চিরকাল পেয়ে এসেছ বলে, তোমার এই মত, না? কেন টুলুদি কিসে নিতুদার অযোগ্য? শুধু রং নেই? না বাপের টাকা নেই?'

ইলা ওসব কথা এড়িয়ে গেল, কিছু বল্লে না। শুধু একটা অহঙ্কৃত হাসির আভাস তার ঠোঁটের পাশে ফুটে উঠল নিমেষের জন্য। সুধীশরা দেখতে পেল কিনা কে জানে।

৭

টুলু একেবারে আশ্চর্য্য হয়ে গেল।

যে কথা সঙ্গোপন-মনেও কখনো সে ভাবতে সাহস করেনি, কল্পনাতেও আসেনি কারুর, সে কথা আজ যেন বাঁশীর সুরের মত, গানের মত, অপরূপ আনন্দের মত তাকে—তার সমস্ত তনু-মনকে আচ্ছন্ন করে দিলে।

তাদের ছোট্ট গণ্ডিঘেরা জগতের সুন্দর বন্ধু, তাদের সেই পৃথিবীর সুখদুঃখের সাথী, ছোটবেলার খেলার সঙ্গী, বড় বয়সের উপেক্ষা অপমানের লাঞ্ছনার নিঃস্তব্ধ সহচর;—টুলুর থেকে অনেক সুদূর, টুলুর কেউ নয়, কোনো সম্পর্কের মধুরতা নেই, তবু পরম প্রিয়জনের মত নীতিশ—সে তার সবচেয়ে আপন হবে!

টুলু বুঝতে পারল না যে সে জেগে আছে না স্বপ্ন দেখছে। সত্য, না মিথ্যা, না ভ্রম।

নিজের যোগ্যতার কথা, নিজের কোনো কথাই তার মনে ওঠে না। সে যেন কোন্ স্বপ্নের সমুদ্রে ডুবে গেল। সে ভাবতেও পারল না, নীতিশ কি ভাবে একথা নেবে। হয়ত এ প্রস্তাব মুখের একটা কথা মাত্র এ বাড়ীর।

কিন্তু সহসা টুলুর তরুণ তনু যেন অপরূপ হয়ে বিকশিত হয়ে উঠ্‌ল। তার কানে ইলার রূঢ় মন্তব্য পৌঁছয়। বড় বৌদির

বিদ্রূপব্যঞ্জক হাসি চোখে পড়ে। ননদের উপর তার বিরাগের অবধি ছিল না।

সহসা টুলুর মনে পড়ে যায় নতুন সম্পর্কের আভাসের কথা। বৌদিরও মনে পড়ে। কিন্তু টুলুর জয় হলেও নীতিশের তো প্রচণ্ড পরাভব হবে। পিতামহীর প্রিয় নীতিশ, ছোটদের 'হিরো' নীতিশ, আশ্রিত বুলু টুলু নলিনের বন্ধু নীতিশ— অনেকেরই প্রিয় ছিল না।

এক কথায় বধূ শাশুড়ীকে অতিক্রম করে গিয়েছিলেন এসেই। শাশুড়ী যখন বধূ, তখন থেকেই তিনি বিভাগীয় কর্ত্রীত্বের দণ্ডভার গ্রহণ করেছিলেন জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূত্বের মহিমায়। কর্ম্মভার নয়। ফলে অনাথ আশ্রিত মেয়েদের জন্য লাঞ্ছনা অবমাননার যে উত্তরাধিকার পাওনা, যাকে এরাও নিত্য ও নৈমিত্তিক ভাবেই লাভ করতে অভ্যস্ত ছিল।

কিন্তু কথা তার কানে পৌঁছলেও আজ আর মনে পৌঁছল না বা মনে দাগ কাটল না। সে যেন কোন্ স্বপ্নের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে রইল।

অস্পষ্ট আশার অজানা সুখের মোহ তাকে নিবিড় ভাবে ঘিরে রাখল। তার সে জগতে ছোটবেলার সাথীরা নেই, বুলু নলিন কেউ নেই, মাও নেই। রমাকে সে 'মা' বলত। একান্ত নিজস্ব তার মোহলোক সেটা। অস্পষ্ট নীতিশকে ঘিরে ঘিরে সেখানে মায়ালোক রচিত হচ্ছে একাকিনী মুগ্ধার!

মনীশ এসেছে। মনীশের বিবাহ উৎসব এগিয়ে এলো।

বুলুরও। একসঙ্গে উৎসবের অনেক সুবিধা। যেন বড় কারখানার 'উপসম্পদ'। আপনি আপনি লাভের সুবিধার সুযোগ পাওয়া যায়। বড় উৎসবের জন ধন কর্ম থেকে উপছে পড়া উদ্বৃত্ত খুদকুঁড়োতে বুলুর বিয়ে হয়ে যাবে। হয়ত নীতিশ ও টুলুরও! কর্তব্যের দায় মোচন হয়ে যাবে।

নীতিশ এসে পৌঁছল।

বিলেত-ফেরত মনীশের চার পাশ ঘিরে উৎসবের আমেজ তখনো রয়েছে। পরিচিত অপরিচিত প্রশংসায় বিস্মিত দৃষ্টিভরা চোখ তখনো তাকে দেখে যায়। তার উপর বিবাহের সমারোহ এসে পড়ল। তারি মাঝে মাঝে বিলিতী নেশায় মুগ্ধ মনীশের অভিমতের টুকরো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। কি করা উচিত আর কি নয়। সেখানে কত কি ভালো এখানে কত কি তেমন নয়। আবার এখানের কত কিছু যে কেমন 'পূর্ব্ব দেশীয়' রুচিময় রূপময়। ইত্যাদি নানা ধরণের নানামুখী অনুকূল প্রতিকূল মত ছিট্‌কে ছিট্‌কে পড়ছে। গুরুজনেরা আত্মীয়জনেরা মুগ্ধ হয়ে শুনছেন সবই। আজকের সত্য কালকের সত্যের সঙ্গে মেলেনা। কথার, মতের যেন লীলা চলছে মনীশের। আর অভিভূত ভক্তজনের মত স্বজনেরা প্রীতি স্নেহ গর্বসিক্ত চোখে তাঁদের 'ক্রোড়দেবতা'র কথা শোনেন। গর্বিত মনীশ শিক্ষিত 'প্রাচ্য' ভাবে ও উদার-ভাবে ব্রাহ্মণ পুরোহিত নির্দিষ্ট মত নিয়ম পালন করে—অবশ্য কিছু অনুকল্প ও বিকল্পে বিবাহ করে এলো। উলুধ্বনি

শঙ্খধ্বনি, পূর্ণঘট, আমের পল্লবের মালা-বাঁধা দুয়ারের সমুখে ভিড়ের মাঝে উপবাসবিশুষ্ক অধর, চন্দন চর্চিত গণ্ড, রক্তাম্বরা, ওদের তরুণদলের এক সময়ের মানসী সুমিত্রাকে নিয়ে মনীশের গাড়ী এসে দাঁড়াল।

সিঁড়ির পাশে দাঁড়ানো অসংখ্য সুবেশ অবেশ শিশু ও বালক-বালিকার মাঝে সহসা চোখে পড়ল নীতিশকে।

মনীশ আনন্দিত ভাবে জিজ্ঞাসা করল, 'কবে এলি ?'

সুমিত্রাও চোখ তুল্‌ল। অকস্মাৎ যেন শুভদৃষ্টি হয়ে গেল। সে শুভদৃষ্টি তো কাল মনীশের সঙ্গে হয়নি।

নীতিশ বল্লে, 'কাল।'

সুমিত্রা আর চোখ তুলল না। খ্যাতিহীন, ধনহীন, হয়ত মনীশের চেয়ে স্বাস্থ্য রূপহীনও বলা যায়, তবু সুমিত্রার তার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের কথা, প্রথম আশ্চর্য্য হয়ে আলাপের দৃষ্টি, প্রথম বাঁশী শোনার দিনের কথা, গান শোনার দিনের কথা মনে হয়ে গেল। না, ভোলেনি ওরা! নীতিশকে কেউ ভোলেনি। ওরা তার নাম করেনি। সে বাড়ীতে নীতিশের নাম ওঠেনি আর। সে বাড়ীর কোনো কন্যা বরমাল্য হাতে নিয়ে এই নির্ধন নীতিশের জন্য বসে নেই। কিন্তু স্বয়ংবরার বরমাল্য তারা হাতে নিয়েছিল একদিন, তারই জন্যে যেন। কেউ জানে না। নিজেরাও না। এমন কি সুমিত্রা নিজেকেও বলেনি।

পাশে গাঁটছড়ায় বাঁধা মালা-চন্দনেভূষিত খ্যাতিগর্বিত মনীশকে যেন হঠাৎ তার খুব সাধারণ বলে মনে হ'ল।

আর তার জন্য বহু যত্নে আহরণ করা, নির্বাচন করা এই সমস্ত সুখ ঐশ্বর্য্যকে তার সহসা অত্যন্ত স্থূল ও গ্রাম্য মনে হল। তার গলা যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল।

দুধে আলতার পাথরে দাঁড়িয়ে লেঠা মাছ মুঠোয় ধরে, মনীশের হাতে করা ধানে ভরা 'রেক' মাথায় নিয়ে বধূবরণ হয়ে গেল।

সুমিত্রার চোখ থেকে দু' ফোঁটা জল পড়ল। উৎকণ্ঠিত হয়ে বরণকারিণীরা জিজ্ঞাসা করলেন, 'মাছ কি হেনে দিল হাতে? চল, চল, দুধ ওথ্‌লানো দেখিয়ে বৌ ওপরে নিয়ে তোলো। মুখ যে শুকিয়ে গেছে। এখনো কুশণ্ডিকা বাকি।'

তার পরদিন বুলুর বিয়ে। বাড়ীতে ভোজ্য উদ্বৃত্তের সম্ভার সম্পদ প্রচুর। নির্বিবাদে কম খরচে বুলুর বিয়ে হয়ে গেল। পাত্র বিধবা মার সন্তান, চাকরী করেন, ভাই বোন আছে, বি-এ, পাশ করেছিলেন—আরো নাকি পড়েন কি সব। বিবাহের চমক্ নেই, ঝলক্ নেই, শুধু কন্যাদায় মুক্তি আছে।

টুলুর পালা এবার। কিন্তু সহসা বিমূঢ় হয়ে গেল যেন সে সুমিত্রার মুখের পানে চেয়ে। এত রূপ? এত সুন্দর? এরই সঙ্গে কি—?—এর সঙ্গেই না এর বোনের সঙ্গে নীতিশের বিয়ের কথা হয়েছিল?

এ যেন রাজকন্যা। রংয়ের আলোয়, চোখের কালোয়, অলঙ্কারের ঝঙ্কারে, বসনের শোভায় যেন রূপকথার রাজকন্যা।

সুমিত্রাও অবাক হয়ে শুনল কয়েকদিনের মাঝেই টুলুর সঙ্গে নীতিশের বিয়ে!

শুধু নীতিশই জানল না।

গোলমাল কমে এল। বুলু অষ্টমঙ্গলার পর ফিরল। সুমিত্রার 'ধুলা পায়ে ঘর বসতি' করা হল।

মেজ জ্যাঠা ডেকে পাঠালেন নীতিশকে। বাইরের ঘরে মনীশের 'চেম্বারে' ইন্দ্রের সভার মত কর্তারা পরম খুসী মনে সদাশয়ভাবে বসে আছেন।

হরিশ নীতিশকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন দেশ বেড়ালো সে? চাকরী-বাকরীর সুবিধা আছে কি এবং স্বাস্থ্য কেমন? আরও কত কি।

গিরীশ জিজ্ঞাসা করলেন, 'সে কি করবে, আর কবে করবে?'

মনীশ বললে, 'তুই না রিসার্চ্চ করছিলি?'

সতীশ বললেন, 'ওটা তো বাজে কাজে নিযুক্ত থাকার মত হচ্ছে। কিছু করুক অন্য রকম।'

নীতিশ জবাব দিল সব।

দেশটা গরম, কিন্তু ভালো। চাকরীর কিছু আশা আছে কি-না জানেনা—কেননা সে খোঁজ করেনি। রিসার্চ্চই করছে, এদিকেই চাকরী পেতে পারে ওর প্রফেসার বলেছেন।

এবারে আসল কথায় আগের গৌরচন্দ্রিকা শেষ হয়ে গেল।

গিরীশ বল্লেন, 'আমরা ভাবছি একবার তোমার বিয়ে দোব।'

নীতিশ জিজ্ঞাসুভাবে চাইল, কিছু বল্লে না।

গিরীশ বল্লেন, 'টুলুর সঙ্গে তোমার আমরা বিয়ের ঠিক করছি।'

নীতিশ অবাক হয়ে চেয়ে বল্‌লে, 'টুলুর সঙ্গে ?'

তারপরেই মাথা নিচু করে নিলে। অপ্রস্তুতভাবে বল্‌লে, 'আমি বিয়ে করব না।'

গুরুজনেরা তার চেয়েও অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের গলার কাছে বহু রকমের বিরক্ত কথা ভিড় করে আটকে গিয়ে ছিল। স্পর্দ্ধা! সাহস! আশ্চর্য্য!......

মেজ জ্যাঠা হরিশের মুখের কাছে আসে ভৃত্যজনোচিত দণ্ড প্রয়োগের বাণী।

দাদা সতীশের মুখে আসে, 'এক পয়সার ক্ষমতা নেই, মতামতের আস্পর্দ্ধা।'

গিরীশের মনে কি এলো, মুখে কি বলতে চাইলেন বোঝা গেল না। তিক্ত কঠিন শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বিয়ে কেন করবে না জানতে পারি কি ?'

নীতিশ খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। বিয়ে করতে ইচ্ছে নেই, এইটেই সত্য। কাকে করবে বা না করার কারণ কি, এ সব তো ভাবেনি। হঠাৎ মনে হল, তাই তো, চাকরী নেই, রোজগার নেই এই 'অর্দ্ধ সত্য'ও বলা যায়।

বলে ফেল্‌ল সেকথা, 'নিজের পায়ে দাঁড়াই।'

ব্যঙ্গভরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বল্লেন, 'ও তুমি ভাবছিলে তোমাকেই খাওয়াতে হবে তোমার স্ত্রীকে এখুনি!'

ভাইয়ের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে তারপর স্থিরদৃষ্টিতে জ্যেঠার পানে চেয়ে বললে, 'আমি এখন বিয়ে করব না, জ্যেঠামশাই',—তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তার ঠিক যেন মনে হল চিরকালের মত সেই ঘর, সেই বাড়ী, সেই স্বজন-পরিজন সকলের কাছ থেকে সে চলে এলো এবং শেষ হয়ে গেল তার সব কথা বলা। আর কেউ তাকে ডাকবেন না। চিরকালের মসৃণ পথে একটা প্রকাণ্ড অবাধ্য 'না' একটা অনতিক্রম্য বা দুরতিক্রম্য বাধা সৃষ্টি করে দিল।

টুলুর কানে গেল এ কথা। লজ্জায় ধিক্কারে,—মনে মনে যদি মৃত্যু হ'ত মানুষের, টুলুর তা হ'ল। যে মনের দিকে একেবারে অসাড় নিঃস্ব হয়ে গেল অর্থাৎ সে যেন সবশুদ্ধ নিজে কোথায় হারিয়ে গেল।

বুলুর সমবেদনা জাগে, তার নতুন বিবাহ হয়েছে।

প্রেমের কথা থাক্, প্রতিষ্ঠা সে পেয়েছে। মেয়েদের বিয়ে তো শুধু বিয়ে নয়।

স্রোতের শৈবালের মত সে আর ভেসে বেড়ায় না।

ইলারও দয়া হয়। সে যেন জানাতে চায়, সে জানত, নীতুদা টুলিকে বিয়ে করবে না কক্ষনো।

বৌদি খুসী হ'ন অকারণেই। নীতিশকে দু' একটা নিন্দাজ্ঞাপক কথা বলেন।

সুমিত্রা হয়ত খুসী হয়, হয়ত হয়না। তারও মৃত্যু হয়েছে বারম্বার। প্রতি বাস্তব রাত্রে, প্রতি স্বপ্নাচ্ছন্ন দিনে। চমৎকার কৌচ টেবিল সেটী সোফা চেয়ারে পালঙ্কে পর্দায় ফুলদানিতে চক্চকে বইয়ে সাজানো বিলাস ঐশ্বর্য্যময় ঘরে সুন্দরভাবে সেজে, সুন্দরভাবে ভূষিত স্বজনের সঙ্গে গল্প করে। সমাগত জনের সঙ্গে সাহিত্য, কলাতত্ব আলোচনা করে, শোনে। মেয়েলী গলায় গান গায়, শেখা গান। রূপগর্বিত পূজাতৃপ্ত হাসি লেগে থাকে তার ঠোঁটে। কিন্তু সে যেন কোথায় এক জায়গায় টুলুরই মতন দুঃখী, বঞ্চিত নিঃস্ব, তার মনে হয়। হয়ত সেটাও তার মনের বিলাস, তবু মনে হয়।

কিন্তু কালো ভীরু উপেক্ষিত টুলু মরে গেলনা, রোগা হ'লনা, তার মনের কথা কেউ জানল না। দু' মাসের মধ্যেই তার একটা বিয়ের ঠিক হয়ে গেল, তিরিশ বিঘা না মানকুণ্ডতে তাদের বাড়ী। ছেলে মালবাবু কিম্বা টিকিট কালেক্টার। আশ্চর্য্য হয়ে টুলু শুভদৃষ্টির সময় দেখল, অত্যন্ত অল্প বয়স একটি শ্যামবর্ণ মুখের দুটি চোখ তার দিকে চেয়ে আছে। সে চোখ বুজলে নির্ভয়ে যেন।

তার পরদিন একখানা ছ্যাক্ড়া গাড়ীর ছাতে একটা তোরঙ্গ ও দানের বাসনের ঝুড়ি বসিয়ে গাড়ীর মাঝে একটি ঝি ও বরবধূকে তুলে দেওয়া হ'ল যথারীতি রমার জননীর

হাতে কনকাঞ্জলী নিয়ে। রমা শান্ত মুখে চুপ করে দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন। এই মাতৃপিতৃহীনা মেয়েটি তাঁর আরো আপনার হতে পারত, হয়ত সুখীও হত তার মনে হচ্ছিল।

এবং তার বিয়ের আগেই আধা বয়কট করা অর্থাৎ গুরুজনের সঙ্গে আলাপ-কথাহীন অবাধ্য নীতিশ তার বাবার ছেঁড়া সুটকেসে তার সামান্য কাপড়-চোপড় নিয়ে কোন এক জায়গায় তার চাকরী হয়েছে বলে গম্ভীর মুখ গুরুজনদের প্রণাম করে চলে গিয়েছিল।

৮

নীতিশকে স্টেশনে তুলতে এসেছিল সুধীশ। বাঁধন-ছেঁড়া সুটকেশ, রং ওঠা টিনের একটা তোরঙ্গতে পড়ার বই, ময়লা সতরঞ্চিতে জড়ানো একটা আধময়লা তোষক, তেমনি চাদর, শ্রীহীন বালিস, বিবর্ণ দীর্ঘকালের পুরাতন লেপ —এই বিছানা কুলীর মাথায় তুলে দিয়ে নীতিশ টিকিট করতে গেল। একটা ছেঁড়া নেকড়ার পুঁটুলীতে সুধীশের মা বা রমা কে কয়েকখানা লুচি তরকারী বেঁধে দিয়েছিলেন, সেটা সুধীশের হাতে ছিল। সুধীশ চুপ করে কুলীর পিছনে দাঁড়িয়েছিল। তার যেন কি অজানা একটা [illegible] গলা অবধি [illegible]কিয়ে গিয়েছিল। চোখে জল আসার মত, কোমল [illegible] [illegible]দনাজ্ঞাপন করার মত দুঃখ নয়। নিষ্ঠুর নিঃসঙ্গ অবাচ্য দুঃখ। জিনিষ-গুলোর দিকে সে চাইতে পারছিল না। মনীশ প্রবীরের বিদেশ-যাত্রার জিনিষপত্র সে দেখেছে। আর তার আয়োজন সমারোহও সে দেখেছে। ব্যাকুল অব্যক্ত বেদনায় সে কিছু ভাবতেও চাইছিল না।

নীতিশ ফিরে এলো।

সুধীশ চারদিকে চাইছিল। বল্লে, 'মেজদা আসবে বলেছিল।'

'ও, তা এখনো তো দেরী আছে। আমার 'বার্থ' না

কেউ দখল করে নেয়। চল্ আগে যাই।' নীতিশ হাসলে হাতের রঙীন ছোট টিকিটখানা সুধীশের হাতে দিয়ে।

তৃতীয় শ্রেণীর পথে ভিড়ের সারির মাঝে সুধীশ নীতিশের সঙ্গে যেতে লাগল। নীতিশের 'বার্থ' দখলের রসিকতায় সে হাসতে পারল না। তার যেন কিসে আকণ্ঠ ভরে উঠেছিল।

গাড়ীর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে সুধীশ বল্লে, 'কেউই এলো না। বুলুর বরও বলেছিল আসবে। মেজ বৌদির (সুমিত্রার) আসবার ইচ্ছে ছিল।'

নীতিশের সব জিনিষ তোলা হয়েছিল। সে শুধু বল্লে, 'কে সুমিত্রা ?'

দুই ভাই উন্মনাভাবে প্ল্যাট্ফরমে ঘোরা-ফেরা করে। গাড়ী ছাড়লে যেন বাঁচে। কথা যেন ফুরিয়ে গেছে। এখন একটার পর একটা যদি কাজ পড়ে বা ঘটনা আসে সমস্ত চোখ কানকে নিঃশেষে নিযুক্ত করে মন বাঁচে নিজেকে লুকিয়ে।

গাড়ীতে ওঠবার সময় দিদি শুধু বলেছিলেন, 'চিঠি দিস্ পৌঁছে।' টুলুর সঙ্গে বিয়ের কথা পেড়ে যেন জ্যেঠামশাইরা দিদিকেও তার কাছ থেকে সরিয়ে দিলেন।

বড় জ্যেঠিমা ঢিলে সোজাসুজি মানুষ, তিনি বল্লেন, 'ওমা তোর চাকরী হ'ল ?' 'মাইনে কত হ'ল ?' 'জানিস না ?' 'তা বেশ' 'তা কিছু খাবি না ?' 'সে কি ?' এক সঙ্গে বহু কথা বলে, অন্যত্র তাঁর—কর্ত্তব্য করতে চলে গেলেন, জবাব না শুনেই।

বাক্যকুশলী মেজ জ্যেঠিমা পরম হাসি মুখে সংলগ্ন বাক্যে আশীর্বাদ করলেন, 'ওমা, চাকরী হ'ল বুঝি, বেশ হ'ল। উন্নতি হোক। এবার এসে বিয়ে কোরো বাবা।' কথায় চিরকাল অপরিমেয় মধু তাঁর, অবশ্য শুধু ঠোঁটে। যেন চাকরীর খবর ও বিয়ের কথা তাঁর জানা নেই।

সুমিত্রা কাছাকাছি কোনখানেই ছিল না। বুলু শ্বশুর-বাড়ী, টুলুকেও দেখা গেল না আশেপাশে। অবশ্য তাতে নীতিশ আশ্বস্তই হয়েছিল। কিন্তু সে তো টুলুকে ভালবাসত। সহসা ঘটনাচক্রে যেন রমার কাছে, তার ছেলে-মেয়ের কাছে, টুলুর কাছে সে অপরাধী হয়ে গেল। কোনো সম্পর্কই যেন আর রাখা যাবে না কারুর সঙ্গে। অন্যদের সঙ্গে না থাক সম্পর্ক। কিন্তু যেন নলিনরা, দিদিরা সব দূরে চলে গেল। নলিনও দেশে নেই। কোথায় চাকরীর জন্য দেখা করতে গেছে। ছোট ছোট ছেলেরা সব কাছে এসে ঘরে দাঁড়িয়েছিল, 'নিতুদা কবে আসবে?' 'বাঁশী আনবে?' 'আমার জন্য ফানুষ', 'আমার রেলগাড়ী', 'আমার মোটর দম দেওয়া'। বেলা, ইলা বড় হয়েছে, ধনী দরিদ্রের ভেদ বুঝতে শিখেছে—মাতৃ-মহিমায় বহুদিন ধরে। তবু আজ তাদের ভাল লাগছিল না।

ছুটী নয়, তাই জ্যেঠামশাইরা বাড়ী নেই। সেইজন্য তাঁরা মোটর বা গাড়ী দিতে পারবেন না। অত্যন্ত দুঃখিত তাই। অবশ্য অনেক সময় অন্য তেমন তেমন লোককে দিতে হয়, তা নিতের তো এমন দরকার নেই।

মেজ কর্ত্তা বলেছিলেন, 'একটা ভাড়াটে গাড়ী আনিয়ে নিস্। ট্যাক্সির দরকার কি। একটু আগে যাস্।'

নীতিশ জানে তা, আর সেইজন্যই তার দুপুরের গাড়ী তুফান মেল। কোনো লোকের আপিস বা গাড়ীর সুবিধার প্রশ্নই উঠবে না।

দুই ভাই উল্‌টে পাল্‌টে এই ধরণের নানা কথা ভাবছিল।

গাড়ী ছাড়বার সময় হয়ে এলো। সুধীশ সহসা জিজ্ঞেস করলে, 'নিতুদা চাকরী কোথায় পেলে?' যে প্রশ্ন সে বারবার ভেবেও করতে পারেনি।

'পাইনি তো ভাই।'

'পাওনি?' সবিস্ময়ে সুধীশ জিজ্ঞাসা করলে।

'না ভাই'।

'কোথায় যাচ্ছ তবে?'

'কিষণগড়ে প্রতুলের কাছে।'

সুধীশের চোখের দৃষ্টি ব্যাকুল হয়ে উঠল, কিন্তু চিরদিনের মত নিষ্ঠুরভাবে সমস্ত আবেগ উচ্ছ্বাসকে প্রকাশ না করতে অভ্যস্ত মন আপনাকে সম্বরণ করে নিল।

নীতিশ তার মুখের দিকে চেয়ে তার হাতটা মুঠো করে নিলে।

গাড়ী ছাড়বার বাঁশী বাজল। গাড়ীতে উঠে জানলা দিয়ে নীতিশ খানিকক্ষণ চেয়ে রইল। ভিড়ের মাঝে সুধীশ বিন্দুর মত মিলিয়ে গেল।

সুধীশের চোখের সামনে শুধু ফিরে ফিরে ভাসতে লাগল, ময়লা বিছানা, ছেঁড়া সুটকেশ পুঁটুলী-বাঁধা খাবার। না, টিফিন কেরিয়ার বা ডিবে নয়, নীতিশদের তো ও সব ছিল না। তার বাবার কিছু নেই ওরা সবাই জানে। তাই সেজ খুড়িমা বল্লেন, ওই পুঁটলী করে দাও না দিদি, ওতেই হবে। একটা এনামেলের গেলাস ছিল······ওরা কে দিয়েছিল।

রাত্রে খাবার সময় মনীশ বল্লে, 'আমি আর সময় পেলাম না। তা ও জায়গা পেল ত ?'

'হ্যাঁ, অনেক', সুধীশ বল্লে।

আশ্চর্য্য হয়ে মনীশ বল্লে, 'কিসে গেল, ইণ্টারে ?'

'না থার্ডে।'

সুধীশ রুটি ছিঁড়ছিল।

'তবে জায়গা অনেক বল্লি যে—?'

'ওতে যে রকম 'অনেক' পাওয়া উচিত সেই রকম পেয়েছে তাই বল্লুম।'

'তাই বল্।'

মনীশের আর কিছু বলবার বা জিজ্ঞাস্য নেই। সুধীশের পাশেই নীতিশের জায়গা সাধারণতঃ থাকত। আজ সেখানে অন্য ছেলেরা কে বসেছে।

সুধীশের মনে মনে সেই খালি জায়গাটা যেন আর ভরানো যাবে না, মনে হতে লাগল। তারা কেউ চাইল দুধ, কেউ মিষ্টি, কেউ রস, কেউ রুটী, কেউ বা লুচি, কেউ বা মাছ—

ভাত। সুধীশও সবই খেল, কথাও কইল। নিজেদের শোবার ঘরে গিয়ে শোয়। মনে সান্ত্বনা আনবার চেষ্টা করে। ওদেরও বিছানা শ্রীহীন, বাক্স বেরং। তবু মনে হয় অত খারাপ কি? সুধীশের লুকোনো মন ম্লান গম্ভীরভাবে ভাবে।

তার মনে পড়ে যায় অনেকদিন আগে দেখা নিঃস্ব নিঃসম্বল কোন এক বিধবা আত্মীয়ার কথা। তাদের বাবার মাসীমা তিনি।

অনেকদিন আগে তিনি কোথা থেকে এসে কয়েক দিন তাদের বাড়ীতে ছিলেন। ময়লা তেলচিটে কাপড় বাঁধা কয়েকটা পুঁটলী, একটা বিবর্ণ ট্রাঙ্ক আর রং ওঠা সতরঞ্চিতে জড়ানো নোংরা দুখানা কাঁথা—এই তাঁর ছিল। রাত্রে তিনি দিদির ঘরে শুতেন, তাতেই তাঁর জিনিষপত্র ওরা দেখেছিল। আর বালকসুলভ কৌতুক করে হাসাহাসি করেছিল সকলে মিলে।

তারপর তিনি একদিন কোন তীর্থ করতে চলে গেলেন। আর ফিরে আসেননি।

ঘর-ভরা অন্ধকারে সে নিঃশব্দে চেয়ে রইল। বিশ্লেষণ করে, বিচার করে বোঝবার মত তখনো তার মন পরিণত হয়নি। শুধু বার বার মনে হতে লাগল তার, তাঁর মত, সেই বাবার মাসীমার মতই নীতিশদা আর হয়ত ফিরে আসবে না।

সহসা তার মনে হল তিনি কি মারা গেছেন?—নেই?

তবে নীতিশও কি সেই রকমই চলে গেছে চিরদিনের মত!

তার কাঁদতে ইচ্ছা হয়, যেন কারো কাছে বলতে ইচ্ছা হয়, আলোচনা করতে ইচ্ছা হয়। মনে হয় এই নিষ্ঠুর অন্যায় ব্যবহারের কথা চীৎকার করে বড়দের কাছে বলা যায় না কেন? কেউ কেন বলে না? ' মা, দিদি, অন্য ভাইরা কেউ বলতে পারেন না? কিন্তু তার চোখে জল আসে না, কারো কাছে বলবার মত কে আছে তাও জানে না। পথহীন নিষ্ঠুর অন্ধকারের দিকে চেয়ে সে চুপ করে ছিন্নবিচ্ছিন্নভাবে নীতিশের কথা, পিতামহীর কথা, তাদের তর্কসভার কথা, মনীশ প্রবীরের বিলাত যাওয়ার কথা, আর আজকার এই নীতিশের শান্তমুখে 'চাকরী পাইনি তো ভাই' বলে গাড়ীতে ওঠার কথা ভাবে।

হঠাৎ মনে হয় ছেঁড়া নেকড়ার পুঁটলীতে বাঁধা ঐ খাবারটা নিতুদা সত্যি খাবে? সে তো কেমন সহজভাবে বল্লে 'দেবে? তা দাও, ওই নেকড়া বেঁধেই দাও।' সে কি দুঃখিত হয়নি, কষ্ট হয়নি তার? সে হলে খেত না। খেতে পারত না! কিন্তু নীতিশের হাতে খরচ করবার মত টাকা ছিল কি? সে খাবার কিনতে পারবে তো? ওতো জিজ্ঞাসা করতে পারেনি। আর কেউ তো জিজ্ঞাসাও করেননি সে কথা। তার কলেজের বন্ধু দরিদ্র একটি ছেলেকে তার মনে পড়ল। বই ধার করে পড়ে, দুখানি মাত্র কাপড় তার, একটি বাড়ীতে ছোট ছেলেদের মাস্টারী করে, সেখানে মাইনে পায় দশ টাকা আর খেতে পায়। কলেজের মাইনে আর খুচরো খরচ তাতেই চলে। চা খায় এক বন্ধুর বাড়ীতে—যদি সে ডাকে।

নীতিশের সঙ্গে তার কোনো প্রভেদ আজ আর নেই। সত্যিই কি নিতুদার কিছু টাকা নেই? আর একটু বড় হলে তখন সে জিজ্ঞাসা করবে বাবাকে, কাকাদের—নিতুদার টাকা কেন নেই।

কিন্তু সুধীশের এই বন্ধুটি তো দেশে আছে, আর তাদের বাড়ীর সকলেই সমান। কেউ বড়লোক নয়, অবস্থাপন্ন নয়।

নিতুদা যে কোন্ দেশে চলে গেল। আর বাড়ীর লোকেরা কেউ বারণ করলেন না, জিজ্ঞাসা করলেন না, কিছু বল্লেন না অবধি। তার বন্ধুর তো মা আছেন, ছোট ভাই বোন আছে। ওর কেউ নেই। হঠাৎ তার মনে হয় টুলুর সঙ্গে বিয়ের কথা। কি দরকার ছিল বাবার এই বিয়ের কথা বলবার। কেন শুধু জিজ্ঞাসা করলেন না। কেন বল্লেন, বিয়ের ঠিক করেছি! নিতুদা যেন বাড়ী শুদ্ধ লোকের কাছে, দিদির কাছেও কি রকম অপ্রস্তুত হয়ে গেল। তাই কি চাকরী হয়নি তবু চলে গেল। ওতো কক্ষনো মিথ্যে কথা বলে না।

কিন্তু টুলু তো বেশ মেয়ে, খারাপ তো নয়। সুধীশ নিস্তব্ধ হয়ে ভাবে। দাবীহীন আশ্রয়হীন দয়ার পাত্রপাত্রীরা নলিন বুলু টুলু দিদির কথা তার মনে পড়ে এবং তাদেরও যে কোনো মুহূর্ত্তে চলে যেতে হতে পারে। তারা এ বাড়ীর কেউ নয়। নিতুদার মতই।

শুধু বুঝতে পারে না, নিতুদা তো বাড়ীর ছেলে, মেয়ে তো নয়, মেয়ের ছেলেও নয়, তবু কেন গেল!

৯

উঁচু-নিচু বন্ধুর ধূলি-ধূসর পার্ব্বত্য প্রদেশের পথ বেয়ে টাঙ্গা এসে দাঁড়াল প্রতুলের বাড়ীর দরজায়।

বাড়ী বড় নয়, কাজেই দরজায় গাড়ী থামলে ডাকার আগেই বাড়ীর লোক চকিত হয়ে ওঠে।

মিলফেরৎ প্রতুল জুতো খুলছিল, বেরিয়ে এলো।

আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে, 'তুই ?'

জিনিষ ক'টি নামিয়ে বারান্দায় রাখছিল নীতিশ, সহজভাবে একটু হাসবার চেষ্টা করে বল্লে, 'হাঁ আমি।'

প্রতুল জিনিষগুলো তুলতে ভৃত্যকে আদেশ করে বল্লে, 'ভেতরে আয়।'

শ্রাবণের গোড়া। জুলাইয়ের শেষ। বিনু মিনুর আনন্দের সীমা নেই নীতিশ দাদাকে পেয়ে। তাদের মাও প্রতুলের মত একটু আশ্চর্য্য হয়েছিলেন কিন্তু সহসা কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না। রাত্রি হ'ল। উঠানে সারি সারি দড়ির খাটপাতা বিছানায় বিনু মিনুকে নিয়ে মা শুলেন। ছাতের উপর দু'খানা খাটিয়ায় দুই বন্ধু শুতে এলো।

প্রতুলের অদ্ভুত সঙ্কোচ হয়। কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারে না। নীতিশও বুঝতে পারে, কিন্তু কি বল্‌বে ? আর পড়ব না—সেখানে ভাল লাগল না—জ্যেঠামশাইরা অপছন্দ করলেন

—টুলুর সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলেন, সে অসম্মত হ'ল তাই —তাই থাকতে সঙ্কোচ হ'ল ?—

আবাল্য নিঃসঙ্গ অপমান অভিমান দুঃখ-কষ্ট একলা ভোগ করতে অভ্যস্ত মন সহজে কাউকে অংশ দিতে শেখেনি। শিশুকালে, একদিন মনে আছে—একজন আত্মীয়া নিজের সন্তানদের সমস্ত খাবার দিয়ে তাকে খাবারের 'জালি' ঝেড়ে ভাঙা গুঁড়ো খাবার দিলেন। নিয়ম মানতে অভ্যস্ত বালক, হাতে করে খাদ্যটা নিলে। তারপর চোখে জল ভরে গেল। একলা ছাতে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। খাবারটা ফেলে দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল, কিন্তু অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ছিল, ফেলে দিতে পারল না। অনেকক্ষণ পরে যেটুকুতে ধুলো লাগেনি, ক্ষুধার্ত বালক সেইটুকুই খেল। তারপরেও বহু দুঃখের দিন এসেছে। মাস্টার মশাইয়ের কাছে গুরুজনের কাছে প্রহার বা মার নয়। কিন্তু নিষ্ঠুর শ্লেষ, বিদ্রূপ, কঠিন দৃষ্টি বালকের মনুষ্যত্বকে বার বার আহত করেছে, অপমান করে গেছে। পিতামহী ছিলেন। কিন্তু তিনিও মা নন। বাপও ছিলেন না, ভাই বোনও ছিল না। অন্তরঙ্গতাহীন কঠোর নিয়মের মাঝে থেকে আজও সে যেন জানে না, শেখেনি মানুষকে কি করে ভালবাসা যায়, কি করে তাদের সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা বলা যায়। ভাল সে বাসে দিদিকে সুধীশকে নলিনদের। কিন্তু কারুকেই তো সে কোনো দুঃখের কথা, অপমানের কথা বলেনি। বলতে পারেনি। আজ তার মনে হয়—সেদিন যদি সে রাগ করে

খাবার ফেলে দিত বা কাঁদত তাহলে কি ভাল হ'ত? হয়ত ভাল হ'ত। মন প্রকাশের পথ খুঁজে পেত একটা যে ভাবেই হোক।

পড়ার অসাফল্যে ছোট বেলায় মাস্টার মশাইয়ের কাছে কথা শোনা, জ্যেঠামশাইদের মূর্খ হাঁদা বোকা বিশেষণ শোনা। তারপর বড় হয়ে ভাল করে পড়াশোনা করেও কোনো উৎসাহ আনন্দের কিছু না শোনা, তারপর বিলাত যাওয়ার আশা; সহসা সুমিত্রাদের বাড়ীর শুনতে পাওয়া কথা মনে পড়ে যায়। নীতিশ যেন নিজের কাছেও নিস্তব্ধ হয়ে যায়। ভাল হয়ত সে কারুকেই বাসেনি। তাদের কিন্তু ভাল লেগেছিল, আশা করেছিল অনেক। কিন্তু এবারে ভাবনার স্রোত ছিঁড়ে গেল।

সহসা সে বল্লে, 'তোদের মিলে আমাদের করবার মত কোনো কাজ নেই, নারে?'

প্রতুলও ভাবছিল অনেক কথা নীতিশেরই। যে কথা কেউ বলে না সে কথাও মানুষ নিজের মন দিয়ে হয়ত বুঝতে পারে। তা ছাড়া বহু তর্কের আসরে বহু আশার দুরাশার বলাই ঠিক—দিনে সে একসঙ্গে ছিল ওদের দলে।

চকিত হয়ে সে বল্লে, 'মিলে? তোর মত কাজ? কেন, তুই পড়া ছেড়ে দিলি?'

'আর কত পড়ব? এবারে কাজ-কর্ম্ম করি।'

'কাজ-কর্ম্ম তো করবিই। কিন্তু পড়াটা শেষ করে নিলে তো কাজ-কর্ম্মের সুবিধাই হ'ত, নয়? রিসার্চ্চ করা শেষ হলে

তো ভাল কাজই পেতিস্। প্রফেসররা তোকে তো ভালই বাসেন। ছেড়ে দিলেন ?'

নীতিশ হাসলে, 'তা হয়ত পেতাম ভাল কাজ কিন্তু কি আর হবে।—প্রফেসররা জানেন না।'

'তবু একটা সম্মান ভাল কাজের আছে তো। হয়ত কিছু করতেও পারতিস্।'

'আমরা ? আমি ? কি করতাম ? চাকরী ছাড়া আমরা কি বা করতে জানি ভাল করেই পাশ করি আর এম-এস-সি, ডি-এস-সিই হই। আমরা ওরা নই। তা ছাড়া আমিও কদিন ধরে ভাবছি কি করতে পারি আমরা। দেখলাম গতানুগতিক পথেই চলতে শিখেছি।'

প্রতুল চুপ করে রইল খানিক, তারপর বল্লে, 'আমাদের মিলের কর্তার একটা কেরাণী বা টাইপিস্ট দরকার, আর হতে পারে এখানকার স্কুলে কাজ।'

'স্কুলে কাজটা করতে পারি, টাইপরাইটিং তো জানি না, শিখে নিতে পারি অবশ্য।'

'এরা কিন্তু মাইনে খুবই কম দেবে। চল্লিশ পঞ্চাশ-এর বেশী নয়। স্কুলেও কি বেশী দেবে, জানি না।'

নীতিশ বল্লে, 'ওতেই আমার চলে যাবে!' সহসা যেন দু'জনেরই কথাটা কানে বাজল। এরই মধ্যে তার সব আশা কল্পনা শেষ হয়ে গেল ? কি তাদের আদর্শ ছিল, কি ভেবেছিল এতদিন ?

প্রতুলের যেন মনে কাঁটা ফোটে, কানে বাজে—'ওতেই আমার চলে যাবে।'

নীতিশ কিন্তু হঠাৎ সমস্ত অনিশ্চিত আশা দুরাশা থেকে মুক্তি পেয়ে গেল যেন। না, আর মাথা নিচু করে অপ্রতিভ দীন মুখে অনুগ্রহ গ্রহণ করতে হবে না। কি জন্য কি কারণ জানা নেই কিন্তু অনুগ্রহ করার যেন শেষ ছিল না। আজ সে মুক্ত। দরিদ্র দীন, কিন্তু করুণাভাজন নয়। নীতিশ হঠাৎ নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে যেন সব বিষয়ে। আর অনুমতি নিতে হবে না, উপদেশ নিতে হবে না, এবারে সব বিবেচনা নিষ্পত্তির ভার তার একলারই। অন্যের সঙ্গে সব মিলিয়ে আর নেই।

প্রতুল ঘুমোয়নি। চুপ করেই কি ভাবছিল কে জানে।

নীতিশ বল্লে, 'যদি স্কুলে কাজটা পাই সেইটেই ভাল হবে, না ?'

'তোর যা ইচ্ছে। দেখা যাক কোনটা তোর ভাল লাগে।'

পার্ব্বত্য রাত্রি গভীর হয়ে ঠাণ্ডা হয়ে এলো।

দুই বন্ধু এবারে সহজভাবে পুরাতন কথা কইতে কইতে ঘুমিয়ে পড়ল।

ভাদ্রের দুপুর। পিতামহীর ছোট পূজার ঘরটা এখন রমার অধিকারে। বুলু এসেছে, টুলুও দু'দিনের জন্য এসেছে। কয়েকখানা বই আর মাসিকপত্র আর ভাগবত নিয়ে রমা বসেছিলেন: ভাগবতখানা ধর্ম্মগ্রন্থ হিসেবে, কেননা সেদিন একাদশী।

সুধীশ এসে বসল, বল্লে, 'অন্ধকার ঘরে পড়া যাচ্ছে?'

রমা হাসলেন, বল্লেন, 'হ্যাঁ, পড়া যায়, একটু আলো আছে।'

সুধীশ ভাগবত নিয়ে পাতা ওলটাতে লাগল, বল্লে, 'এ বই ভালো লাগে তোমার দিদি?'

বুলু বল্লে, 'আজকে মার একটু ধর্মের বই পড়া নিয়ম, ঠাকুমা পড়তেন মনে নেই?'

রমা বল্লেন, 'বকিস্‌নি। প্রায়ই তো নিয়ে বসি।'

বড়বৌ ঢুকলেন দরজা ঠেলে, 'ঠাকুরঝি ওঘরে যাবে? বড় গরম আজ, না?'

'কই ভাই গরম এমন আর কি, রোজ যেমন তাই তো।'

'আজকে ওঘরে গেলে ঘুমুতে পারতে পাখার তলায়'—পরম মিষ্টভাবে বড়বৌ বল্লেন।

সুধীশের ঠোঁটের পাশে একটু হাসি ঝিকমিক করে উঠল। বুলু টুলু নীরবে দুখানা বই খুলে বসেছিল।

রমা বল্লেন, 'আচ্ছা, এখন তো শোব না, পড়ছি পরে যদি শুই তো যাব।'

'বুলু টুলু যাবি ও ঘরে?'—মাতুলানী জিজ্ঞাসা করলেন।

বুলুর মুখে এলো—আমার শ্বশুর বাড়ীতে তো পাখা নেই। আর এমনই তো চিরকাল শুতাম ও পড়তাম,—বলল না কিন্তু, শুধু বল্‌লে, 'না মামী, আমরা মার সঙ্গে একটু গল্প করছি। তিনি চলে গেলেন।

সুধীশ অনেকক্ষণ পরে একটু হেসে বল্‌লে, 'আজ কাল বুঝি তোমরা একটু পাখার প্রসাদ পাও ?'

রমা উত্তর দিলেন না একথার। জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁরে সুধি, নিতুর চিঠি পাসনি ?'

সুধীশ বল্‌লে, 'হ্যাঁ কাল পেয়েছি।' বুলু টুলু উৎকর্ণ হয়ে উঠল। রমা বল্‌লেন, 'কেমন আছে ? চাকরী করছে ?'

সুধীশ বাড়ীতে বলেনি তার চাকরী না পাওয়ার কথা। আজ বল্‌লে, 'তখন সে চাকরী পায়নি। এখন পেয়েছে একটা।'

রমা আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লেন, 'তখন পায়নি ? বল্‌লে যে পেয়েছি ?'

সুধীশ বল্‌লে, 'উপায় ছিল না। এমন একটা অসুবিধেয় তাকে সবাই ফেললেন নিরুপায় হয়ে দেশ ছেড়ে বাঁচল।'

সকলেই চুপ করে রইলো।

অনেক পরে বুলু বল্লে, 'মা, তুমি কেন দাদামশাইকে বললে না যে, নিতুমামাকে তুমি আগে জিজ্ঞাসা করবে ? তাহলে এরকম হ'ত না। নিতুমামা যেন অপ্রস্তুত হয়ে চলে গেলেন।'

রমা টুলুর মুখের দিকে একবার চাইলেন তারপর বল্‌লেন, 'আমি বুঝতেও পারিনি, আর সময়ও পেলাম না—কিছু বলবার। হুটো বিয়ে গেলো তার মাঝে ও এলো আর হঠাৎ কাকারা আর বাবা জিজ্ঞেস করলেন।' বুলু বল্‌লে, 'মেজ মামারা বিলেত গেলো, ও যেতে পেলো না। তারপর

বড়মা (রমার পিতামহী) মারা গেলেন, ওর মনও খারাপ ছিল। তা ছাড়া ওর কাজকর্মও তো ছিল না। কাজ থাকলে হয়ত অমত করত না।'

রমা বল্লেন, 'অমত করলেও তো দোষ ছিল না। আমার সঙ্গে নিতুর সম্পর্কই আলাদা যে! ছোট খুড়িমার আর আমার একসঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। খুড়িমা যখন এলো বাড়ীতে ছোট্ট কনে বৌটি, কেবল কাঁদত, আমারো শ্বশুরবাড়ী গিয়ে মন কেমন করত। আমাদের দু'জনে যে ভাব হয়েছিল, —সমান ছিল,—সে যতদিন বেঁচে ছিল। ঐ ছেলেকে ছোট ক'বছরের রেখে তো সে গেল।'

সুধীশ জিজ্ঞাসা করলে, 'দিদি, খুড়িমা কেমন দেখতে ছিলেন?'

'খুব পরিষ্কার দেখতে ছিল আর ভারি মিষ্টি স্বভাব ছিল। বেশ গান গাইতে পারত। লেখাপড়াও তখনকার হিসেবে বেশ জানত।'

'কাকা নাকি নিতুদার সমস্ত টাকা খরচ করে দিয়েছিলেন?' সুধীশ জিজ্ঞাসা করলে।

রমা একটু অবাক হয়ে বল্‌লেন, 'কাকা সব টাকা আর কি করে খরচ করবেন। মারাই তো গেলেন খুড়িমা যাওয়ার ক'বছর বাদে। একটু গান বাজনার সখ ছিল, যেখানে ভাল গান হবে শুনতেন সেখানে যেতেন। আর নিজেও বেশ ভাল গাইতেন। বাঁশী বেহালা নিতুর চেয়ে ভাল বাজাতেন।

তাতেই তো সব খরচ হয়ে যায়নি। দাদা মারা গেলেন নিতুর জন্যে কিছু লিখে না রেখেই—তাই নিতুর আজ কিছু নেই'।

বুলু বল্লে, 'ওর মামার বাড়ীতেও কেউ নেই?'

রমা বল্‌লেন, 'আছে খুড়িমার ভাই বোনেরা কিন্তু মা বাবাতো নেই, কে আর খোঁজ খবর করে।'

রমা একটু চুপ করে থেকে বল্‌লেন, 'এমন হ'ল যে নিতু যেন অপ্রস্তুত হয়ে চলে গেল। আমিও না পেলাম সময়, না বলতে সাহস করলাম যে আমি কিছু মনে করিনি। টুলুও কিছু মনে করেনি। যদি বিয়ে হ'ত তো সে আমার খুবই আপনার হ'ত। কিন্তু না হলেও তো সে পর হয়ে যায়নি। আর টুলু বুলুরও সে পর ছিল না। এই কথাটাই যদি না উঠত!'

বিবাহিতা টুলু নির্ব্বাক নিস্তব্ধ হয়ে শুয়েছিল। মন যেখানে নিঃশেষ হয়ে গেছে, তারও নীচে যেখানে সচেতন ভাবনা যায় না, সেখানে তার কি প্রশ্ন ছিল, কি ক্ষোভ ছিল, সেখানে নিতু অপরাধী অথবা সে-ই নিতুর কাছে, সকলের কাছে অপরাধিনী হয়ে আছে সে জানে না। শুধু একটা বিষণ্ন ছায়া চিরকালের মত সেই খানটা আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তার ওপরে বাইরে শুধু আছে—'আজ আর তার কিছু ভাবতে নেই'। প্রকাণ্ড সেই 'না' দিয়ে তার মনের আকাশ পাতাল ঢাকা থাকবে চিরকাল।

সুধীশ বুলু একবার চকিতের মত টুলুর দিকে চাইল। কথাগুলো ওর সামনে হওয়া ভালো হল, না ভালো হ'ল না ?

রমা ভাগবতের পাতা থেকে নৈর্ব্যক্তিক সান্ত্বনা খুঁজছিলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল 'ওরে ভীরু তোর হাতে নাই ভুবনের ভার'।

১০

টুলুর শ্বশুরবাড়ী। বিধবা শাশুড়ী, খুড়শাশুড়ী ও ছোট ছোট দেবর ননদে ভরা ছোট্ট সংসার। তার সমবয়সী মাত্র একটি ননদ।

নীতিশের মতই আবাল্য মাতৃহীন পরপ্রতিপালিত টুলুর মন যেন বরফে চাপা। কখন কখন কারুর স্নেহের উত্তাপে সে বরফ গলেছে একটুখানি। কিন্তু ঐ একটুখানিই।

ওদের বাড়ীতে কালো অনাথা টুলু যেন রাজকন্যা হয়ে এলো। বড় ঘরের আওতায় প্রতিপালিত হয়েছে, বড় বংশের মেয়ে,—শাশুড়ী প্রশ্রয় দেন, খুড়শাশুড়ী স্নেহ দেখান, দেবর ননদরা সম্মান করে। স্বামী অনেকখানি সম্ভ্রম করে। তার যেন সমীহ হয়। ঐ সহরে মানুষ হওয়া লেখাপড়া জানা ম্যাট্রিক পাশ মেয়েটির পাশে নিজেকে, নিজেদের অনেকখানি ছোট মনে হয়।

শাশুড়ী ছোট ছোট কাজ করতে বলেন, ভাবেন তার অভ্যাস নেই, কষ্ট হবে।

খুড়শাশুড়ী বলেন, 'কখনো করেনি দিদি, ওকে অত কাজ করতে দিয়ে কাজ নেই।' ছোট ছোট ননদরা দেবররা কত কত কাজ করে। সহসা টুলু সচেতন হয়ে উঠ্‌ল। হাতের কাছে বই নেই, সখের সেলাই নেই, সৌখিন কাজ করা নেই,

তাই নিয়ে আস্ফালন নেই। এদের জীবন-যাত্রায় তার জানা কাজ কিছুই নেই। সারাদিন ধরে জল আনা, গোয়াল পরিষ্কার করা, ধান সিদ্ধ করা, গরুর ভাত রান্না, কিষাণদের খাওয়ানো·······দেখতে দেখতে তাঁদের তিনটা বেজে যায়।

টুলুও ধীরে ধীরে নিজেকে তাদের কাজের মধ্যে ডুবিয়ে নিল।

শাশুড়ীকে বলে, 'মা, আপনি জিরিয়ে নিন। আমি গরুর ভাত রান্না করছি, ধান সিদ্ধ করছি।'

শাশুড়ী সামান্য আপত্তি করেন, তারপর আঁচল পেতে খোলা দাওয়ায় ঘুমিয়ে পড়েন।

রান্নাঘরের জানলায় বসে থাকে টুলু।

নির্জ্জন গ্রাম্য পথ, আলোয় ছায়ায় ভরা গভীর সবুজ বন, অপরূপ কোমল নীল আকাশ।

কিন্তু তার মন যেন মূঢ় হয়ে গেছে। ভাবনা নেই, বেদনা নেই, ক্ষোভ নেই, আশা নেই। উদাস দৃষ্টিতে সে চেয়ে থাকে। ধান সিদ্ধ হয়ে যায়, ভাত নেবে যায়, কিষাণ ছেলে গরুকে খেতে দিয়ে নিজে খেতে বসে। মাথায় চুকচুকে করে তেল মাখা কালো কিশোর ছেলে বসে বসে পুঁইডাঁটা, কলাইয়ের ডাল আর চুনো মাছের টক দিয়ে প্রচুর ভাত খায়। বাড়ীশুদ্ধ সকলে ঘুমায়। টুলু খাবার দিয়ে—বসে বসে খাওয়া দেখে।—

সহসা তার মনে হয় এত সহজ জীবন কেন তার হ'লনা, —লেখাপড়া শেখা, ওখানে এতদিন থাকাতে তার কি হ'ল!

বুলু মাঝে মাঝে একখানা দুখানা বই পাঠিয়ে দেয়! তার সব বিস্বাদ মনে হয়। কোন্ সুখ-দুঃখের কথা সে পড়চে, কার সুখ-দুঃখ! কার প্রেম! টুলুর মুখে না মনে তার অজ্ঞাতেই একটা হাসির আভাস ফুটে ওঠে।

গভীর অচেতন অন্তরের কোন একখানে যেখানে সকল মানুষের স্বপ্নলোকবাসিনী রাজকন্যা ঘুমিয়ে থাকে, যেখানে টুলুরও ছিল, তার ঘুম কেন ভাঙালো, কে ভাঙালো। সে কাকে ভালবাসতে চেয়েছিল?—সে কি ভালবেসেছিল কারুকে?

প্রত্যাখ্যাতা অপ্রতিভ তরুণী নিঃস্তব্ধ হয়ে যায়—আর ভাবতে চায় না। কিন্তু তার চোখে জল আসে না, মনে রাগও আসে না। যেন শুধু অবাক হয়ে—আশ্চর্য্য হয়ে সে চেয়ে থাকে।

পৃথিবীর আর সকলের সব জিনিষ এত সোজা এত সহজ কি করে হয়। ঐ যে কিষাণ ছেলে খাচ্ছে, ঐ রাখাল বালক মাঠে গাছতলায় শুয়ে গান গাইছে, 'ওরে রামশশী যদি কাঁঠাল খাবি তো বিচিগুলো রাখিস্ যতন করে,'—এই যে শান্ত প্রকৃতির দুটি বিধবা নারী সেই যে তার মা (দিদি, নিজের জননীর কথা তার মনে পড়ে না,) তাদের কাছে এই জীবন, এই সুখ-দুঃখ এত সোজা কি করে হয়েছিল। কেন বেলা, ইলা, বুলু কেমন বরের চিঠি, গহনার ডিজাইন, শাড়ীর পাড় আঁচলা নিয়ে কত গল্প করছিল, এই সেদিনও। শুধু সুমিত্রা বৌদি যেন অন্যমনস্ক। তার নীতিশকে মনে পড়ে যায়।

সে চকিত হয়ে উঠে পড়ে। ভাঁড়ারে যায়, মুড়কী, শশা, কলা নিয়ে খাবার গোছাতে বসে—এখনি দেবররা আসবে।

আবার কাজের চাকা জোরে ঘুরতে থাকে। মন্থর দিন শেষ হয়ে এলো। সন্ধ্যার পরই রাত্রি যেন গভীর মনে হয়। সে ননদের পাশে শুয়ে পড়ে।

স্বামী সপ্তাহান্তে বাড়ী আসে। নিরীহ শান্ত গ্রাম্য ভদ্র যুবক, যার মনে কোনোদিন বিশেষ কোনো আশা দুরাশা জাগেনি। কোনো মোহময় দুর্বার প্রেম, কোন গভীর উদ্বেল বিরহ, উদাস কোনো অভাব বেদনার কথা সে জানে না।

শাশুড়ী বলেন, 'বৌমা, নরেনের কাপড় গামছা জল খাবার সব ঠিক করে দিয়ে এসো।'

তন্বী শ্যামা ঈষৎ দীর্ঘাঙ্গী তরুণী মেয়েটি সকলের সমস্ত আদেশ পালন করে।

ননদ বলে, 'মা, বৌদি কত কাজ করে, কাপড় একটু ময়লা হয় না।'

খুড়শাশুড়ী বলেন, 'হাঁ, যেন মনে হয় সেজেগুজে বসেছিল অথচ কিছুই তো প'রে না। যা তোরা পরে আছিস তাই পরে।'

টুলুর স্বামীকে জলখাবার চা সব দেওয়া হয়, রাত্রের আহারও শেষ হয়, কিন্তু সেদিন আর তার কাজ শেষ করা হয় না।

শাশুড়ীদের পায়ে তেল মাখাতে বসে, তারপর দেবরদের গল্প বলতে বসে।

অনেক রাত্রে সে ঘরে আসে শুতে। আস্তে আস্তে স্বামীর মাথায় হাত বুলাতে বসে। সে দু'একবার প্রতিবাদ করে তারপর ঘুমিয়ে পড়ে।

সে নিঃশব্দে জানালার ধারে বসে থাকে চৌকীর পাশে। বাইরের রাত্রির মত কোন্ গভীর রাত্রি যেন তার সমস্ত জীবন আচ্ছন্ন করে রেখেছে! প্রভাত কি হবে? কবে সূর্য্য উঠবে তার? সে কোন্ সূর্য্য? মৃত্যু, না পরম আনন্দ কোনো? অত কথা সে জানে না শুধু উদাস চোখে সে চেয়ে থাকে। তার মনে হয় মীরাবাইয়ের কথা। রাজরাণী হযেও যিনি সংসার ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেতো কৃষ্ণপ্রেমের জন্য চলে গিয়েছিলেন। তার—? তার তো কোনো কিছুই মোহ নেই। ঘর-সংসারের কোন্ লোভ মানুষকে বাঁধে? তাকে কেন বাঁধ্ল না? সংস্কারমুগ্ধ ব্যাকুল সঙ্কোচে তার মনে হয়,—স্বামীর সোহাগে বাহুবন্ধনে তার মোহ নেই। কোনো মধুর অপরূপ ভবিষ্যতের আশার কথাও তার মনে জাগে না। তার জীবন যেন জীবন নয়, কিন্তু মৃত্যুর কথাও তো সে ভাবে না।

শুধু প্রভাত হোক, প্রভাত হোক, আলো হোক। সকলের ঘুম ভাঙুক। তারপর সে একটানা কাজ করে যেতে পারবে। সেই তার মুক্তি। অনেক রাত্রে ক্লান্ত হয়ে সে স্বামীর পাশে

শুয়ে পড়ে। সপ্তাহান্তিক দুর্বহ রাত্রি শেষ হয়ে যায়, দিন আসে। তারপর আবার প্রতিদিনের রাত্রি আসে, দিন আসে।

অকস্মাৎ একদিন আরো কাজ খুঁজে পেল টুলু।

শাশুড়ী বল্লেন, 'বৌমা, ছোট ছেলেদের পড়াগুলো একটু দেখে দাও না বাছা।' আর নিরক্ষর খুড়িমা বল্লেন ওপাশ থেকে, 'আমাদের একটু মহাভারত শোনাও না মা।' এবার দিন অবসরহীন হয়ে ওঠে রাত্রিও নিরবসর হয়ে যায়।

বালকদের আনন্দময় উৎসাহময় কোলাহল টুলুকে যেন কোন্ ছেলেবেলায় নিয়ে যায়। যে ছেলেবেলার কথা সে জানে না, তারা জানে না। এ যেন সহজ সরল রাখাল বালকের বাল্যকাল। এরা ধূলা মেখে হাডুডুডু খেলে, বর্ষার ভরা দীঘির জলে সাঁতার কাটে, গাছে ওঠে, মাঠ থেকে গরুকে খুঁজে আনে। এদের ভয়হীন ভোগবিলাসহীন একান্ত গ্রাম্য জীবন। এরা ফুটবল জানেনা, স্কিপ জানেনা, ক্রিকেট জানেনা।

মাঝে মাঝে তারা টুলুকে কলকাতার কথা জিজ্ঞাসা করে, তাদের কলকাতার বিলাস প্রাচুর্য্যময় জীবন-যাত্রার ওপর লোভের সীমা নেই, কৌতূহলেরও সীমা নেই। টুলু হাসে।

এবার সহসা লোভ-মোহ-হীন এক দীন অভিজাত দুহিতার মন তাদের সকলের ওপর স্নেহে মমতায় করুণায় ভরে উঠল। বহু বিলাসের উপকরণ সেও দেখেছে, বহু আকাঙ্ক্ষা তারও ছিল। প্রয়োজনহীন প্রয়োজনীয় বস্তুতে সে বাড়ী ভরা

দেখেছে। তাই নিয়ে প্রতিযোগিতাও দেখেছিল। ক্ষোভও দেখেছে, তার নিজের মনেও কত আশা লোভ ছিল।

আজ গল্প করতে বসে তারি মাঝে কোথায় যেন এক অপরূপ রূপকথা সে খুঁজে পেল। ভয়ে ভীত শাসনে সংযত প্রশ্রয়হীন কোন্ শিশুদলের কথা,—তবু তারি মাঝে সুখে দুঃখে মধুর ছোট বেলার সেই কথায় টুলুর মন অন্যমনস্ক কোমল হয়ে আসে।

শাশুড়ীরা সেই গল্প ও অন্য কত কথা শোনেন। ছেলেরা শোনে, স্বামীও মাঝে মাঝে শোনেন। টুলু এবারে যেন নিজেকে ভুলে যেতে লাগল।—যদি মানুষ নিজেকে ভুলতে পারে।

১১

মিশনারীদের ছোট স্কুল, ছাত্র আছে। কিন্তু মহারাজার অবৈতনিক হাইস্কুলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে না।

একটি শান্তশিষ্ট গোঁড়া ধার্মিক সাহেবের অধীনে কয়েকজন ক্রিশ্চান মাস্টার আছেন। এম-এস্-সি ডিগ্রীর জোরে, হিন্দী-না-জানা বাঙালী নীতিশের চাকরী হয়ে গেল। অঙ্ক ইংরেজী পড়াবে।

ছাত্ররা বেশীর ভাগই বর্ণহিন্দুর ঘরের নয়। হয়ত কোনোদিন তাদের মাঝ থেকে একটি দুটিও খৃস্টধর্ম্মের ছায়ায় আশ্রয় নিতে পারে এই আশায় মিশন আছে। যদিও বছর পঁচিশ ত্রিশ আগে যেভাবে ক্রিশ্চান হ'ত এখন আর তা হয় না! তবুও আশা মিশনের আছে। এখন সেই আগের ধর্মান্তরিতদের ছেলেমেয়েরা পড়ে ও পড়ায়। আর সঙ্গে সঙ্গে কামার-কুমোর, মুচি হরিজন নানা জাতির ছেলেরা পড়ে, তাদের মাঝে গরীব ব্রাহ্মণ বেনিয়ার ছেলেরাও আছে, মুসলমানও আছে।

নীতিশের ভালো লাগল। যদিও ধর্মের আশ্রয় নিয়ে কচকচি ভাল লাগে না, তবু মনের কাছে অস্বীকার করবার উপায় নেই, যেভাবেই হোক সব জাতের ছাত্ররাই সমান ব্যবহার পাচ্ছে।

ক্রিশ্চান মাস্টারদের মাঝে একজন সেকালের ধর্মান্তরিত ব্রাহ্মণ খৃস্টান।

একটু আধটু আলোচনা হয়। অদ্ভুত লাগে নীতিশের—খৃস্টধর্মের গোঁড়ামীও যেমন তাঁর, তেমনি পুরাতন ব্রাহ্মণ্যের গর্বও কম নেই।

তাদের বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে আলাপ হয়। যমুনা বাঈ আর গঙ্গা বাঈ, মা আর মাসী। মাসীর একটি মাত্র মেয়ে ডাক্তারী পড়ে কোথায় কোন মেডিক্যাল স্কুলে। সেকালকার হিন্দু ঘরের বিধবা, অল্পবয়সে স্বামী মা বাপের মৃত্যুর পর দুই বোনে নানারকম লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন। অবশেষে মিশনের এক মেমের প্রস্তাব আসে। খাওয়া-পরা আশ্রয় সম্মান সবের ওপর ছেলে মেয়ে দুটিকে মানুষ করে দেবে ওরা; এই অতি সাধারণ প্রয়োজন অথচ পরম প্রয়োজন, ধর্ম নয়, পরলোকে ত্রাণকর্তার 'সেভিয়রের' আশ্রয় নয়, মানুষের নিত্যকার দরকারের অন্ন-আশ্রয়ের তাড়নায় তারা ধর্মান্তরিত হ'ল।

ছেলেটি মানুষ হয়েছে, স্কুলে মাস্টারী করে। মেয়েটি এখনো পড়ছে।

আর তাদের কি রাগ কি বিতৃষ্ণা পরিত্যক্ত ধর্মের (সমাজের) ওপর। ধর্ম যে কিছু করেনি, সমাজের নিয়মেরই দোষ সেকথা তারা জানে, বোঝে—মাঝে মাঝে কিন্তু ঘুরে-ফিরে বারেবারে বলে, 'তোমাদের ধর্ম' 'তোমাদের সমাজ' আর 'তোমরা' এই করেছ।

নীতিশের মনে পড়ে কালা পাহাড়ের ঐতিহাসিক বিরাগের অভিযান।

আপনার জন যখন পর হয় এমনিভাবেই চিরকালের মত দূরে চলে যায়। নিজের কথাও মনে হয়।

তবু গঙ্গাবাঈ যমুনাবাঈ লোক ভালো। বেশ স্নেহভরে গল্প করেন, পুরাতন ব্রাহ্মণ্যের সংস্কার শুচিতা, খৃস্টীয় পরিচ্ছন্নতা, সুশ্রী করার রুচির সঙ্গে মিশেছে পুরানো হিন্দুভাবের, সৌজন্যের সঙ্গে এই সমাজের শিষ্টাচার করে আপনার করার চেষ্টা করেন তিনি।

জিজ্ঞাসা করে 'বাবুজী চা খাবেন? না জাত যাবে?'

নীতিশ হাসে, বলে, 'আপনারা মা বহিন, খাবই তো। খোদ সাহেবের কাছে, আসল অখাদ্য খাওয়া সাহেবের বাড়ীতেই চা খেয়েছি।'

ওরা দুই বোনে অখাদ্যের নামে অন্য মনে 'রাম রাম' না 'হারাম' কি বলে,—বলে আমরা কিন্তু ওসব খাই না।

ছোট বড় ছুটীতে মেয়ে আসে। মেয়ের হিন্দু নাম ছিল কাবেরী বাঈ, ধর্মান্তরের পর তার নাম হয়েছে ধর্মমাতার নামে —রুথ কাবেরী হীরালাল মিশ্র।

হীরালাল মিশ্র বাপের নাম।

মেয়ে সুশ্রী, ভালো দেখতেই বলা যায়। রং পরিস্কার, চমৎকার হাসি, ঝকঝকে দাঁত, চোখ মুখ ভালো।

সমাজের কোনো চাপ নেই, ভাবতে পারার আগেই ভাবনার

ভার চাপিয়ে দেয়নি কেউ, বলেই বোধহয় ছোট্ট খরস্রোতা পার্বত্য তটিনীর মতই তাকে উচ্ছল আনন্দিত মনে হয়।

আর সে এলে বাড়ীতে আস্তে আস্তে ছোট্ট খৃস্টান সমাজের ছেলেরা অনেকেই আসে যায়।

জননীর চা পানের প্রস্তাবে রুথ (তাকে রুথ বলেই ডাকা হয়) বল্লে, 'মা, যদি ওঁর জাত যায় তোমার দোষ হবে কিন্তু। অবশ্য আমাদের দল ভারী হয়ে ভালই হবে। মনে নেই আমাদের কি করে জাত গেল?'

তার মুখে কৌতুকের হাসি ফুটে ওঠে।

নীতিশ জিজ্ঞাসা করলে উৎসুক হয়ে, 'কি করে গেল আপনাদের জাত যমুনাবাঈ?—কেন, আপনি ইচ্ছে করে ধর্মান্তর গ্রহণ করেন নি?'

যমুনাবাঈ একটু দ্বিধা ভরে চুপ করে রইলেন।

রুথ বল্লে, 'সে এক মজার ব্যাপার—আমি তখন বছর সাতেকের, আর মোহনলাল দাদা আট বছরের। আমরা ছুজনেই বাড়ীর কাছে বিনা মাইনের মিশন স্কুলে পড়ি। আমাদের প্রাইজ হল ওদের বড়দিনের আগে। সেদিন মেম সাহেব আমাদের সকলকে বিস্কুট ফুলপাতা দেওয়া চমৎকার কেক দিতে লাগলেন; অনেক ছেলে নিল, খেয়ে ফেল্‌ল। বড়রা অনেকে নিল না। আমি আর মোহন ভাইয়া তার পরদিন খাব, আর বাড়ীতে দেখাব বলে—হয়ত আর কারুকে দোবও ভেবেছিলাম একটু নিয়ে এসেছিলাম।

তারপর আর কি—আমাদের ঘরে ঢুকতে দেওয়া হল না। জিজ্ঞাসা করা হল ঐ বিস্কুট খেয়েছি কি না। ছোট ছিলাম, প্রথমে সত্যি কথাই বললাম, খেয়েছি। তারপর মায়েরা কাঁদতে লাগলেন, তখন বল্লাম—খাইনি।

যাই হোক, মা'দের ভাইরা এলেন, তাঁদের জেরায় প্রমাণ হ'ল খেয়েছি। একান্নবর্ত্তী 'পল্লীওয়াল' ব্রাহ্মণ পরিবার, মিতাক্ষরার অধীন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বাপের বাড়ী মামার বাড়ীর সমস্ত আপনার লোকদের সামনে আমাদের দুজনের জাত চলে গেল।'

নীতিশ আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে, 'প্রায়শ্চিত্ত করেও নেওয়া হল না জাতে?'

এবারে মোহনলাল বল্লেন, 'সেতো আরো কত বছর আগের কথা। তা ছাড়া ভারতবর্ষের সমাজের সকল স্তরে তো এক-সঙ্গে বিচারবুদ্ধি বা শিক্ষা জাগেনি। প্রায়শ্চিত্ত শুদ্ধি এখন হচ্ছে,—তখন সে কথা জানাও ছিল না, আর ভাবেই বা কে আমাদের জন্য, বাপ তো ছিলেন না।'

নীতিশ আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে—'তারপর? খৃস্টান হয়ে গেলেন?'

মোহনলাল বল্লেন, 'না,—তারপর? সবাই কি পরামর্শ করে আমাদের দুজনকে আলাদা করে রাখলেন, বাইরের দিকের একটা চাকরদের ঘরে। আমাদের রুটী তরকারী আসত শালপাতায় আর দোনায় করে। বাসন ক্রমে আলাদা করে

দেওয়া হল। মায়েরা এসে রাত্রে শুতেন। তারপর তা নিয়েও কথা হতে লাগল। বোধহয় বাড়ীতে মামী মামারা অপছন্দ করলেন, পাছে তাঁদের ছেলেমেয়ের বিয়ে না হয়। তখন মা আর মাসীমা তুজনে একটা ছোট বাড়ী নিয়ে আলাদা হয়ে রইলেন।

এবারে রুথ হেসে বল্লে, 'আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁদেরও জাত গেল।'

এবারে যমুনাবাঈ বল্লেন, 'তাই বলে আমরা তো আমাদের ধর্ম ছাড়িনি।'

রুথ হাসলে, বল্লে, 'কিন্তু ধর্ম তোমাদের ছেড়ে দিয়েছে।'

গঙ্গাবাঈ এসেছিলেন। তিনি বল্লেন, 'ধর্ম তো মনে। যে ধর্ম লোকের সমাজের, আমাদের গেছে বটে।'

তারপর একটু বিতৃষ্ণা ভরে বল্লেন, 'চিরকাল রক্ষণশীল ব্রাহ্মণের মেয়ে ছিলাম তাই, নইলে মনে হয় যারা আমাদের চাইল না, আমাদের তাদের ছাড়াই ভালো ছিল।'

স্কুলের আর একটি মাস্টার এলেন। কম বয়স। জাতে সূত্রধর। বাল্যকালে পিতৃমাতৃহীন, কেমন করে—এদের আশ্রয়ে এসেছিলেন আর খৃস্টান হলেন মনে নেই। লেখাপড়া শিখেছেন এদের আশ্রয়েই। শিক্ষিত বলা যায়, পড়া শোনাও করেন মন্দ নয়। রুথের প্রতি একটা মোহ বা ঝোঁক পড়েছে বোঝা যায়। আর সেইজন্যই রুথের মা মাসী তাকে একেবারে পছন্দ করেন না। নাম পল শিউশরণ।

যমুনাবাঈ গঙ্গাবাঈয়ের কথার উত্তরে বল্লেন, 'একরকম তো ছাড়াই হয়েছে, কে আর খোঁজ খবর করে বলো। আর জানো বাবুজী, সেই বালকদের বিস্কুট খাওয়ার অপরাধে আমরা ধর্মচ্যুত হলাম। আর আজ বড় গোবিন্দলাল বিলাত ঘুরে এসেও জাত রয়েছে তার। কাশী উজ্জয়িনী মিথিলার পণ্ডিতদের এনে প্রায়শ্চিত্ত করা হয়েছে। বহু খরচ করেছেন ভাইরা।'

নীতিশ একটু হাসলে, বল্লে, 'বহু খরচ করেছেন তাঁরা সেইটেই তো গোড়ার কথা, আসল কথা। বহু খরচ করবার সামর্থ্য আপনাদের থাকলে আপনারাও প্রায়শ্চিত্ত করে জাতে থাকতেন। টাকা দিয়ে পণ্ডিতদের মতামতও কেনা যায়।'

গঙ্গাবাঈ তিক্তভাবে বল্লেন, 'ঠিক বলেছ বাবুজী।'

যমুনাবাঈ চা দিলেন। অতিথিদের কথার স্রোত অন্যদিকে বইল।

১২

পাঁচ টাকা ভাড়ায় খেলাঘরের মত ছোট জানলা, জালিকাজ করা গবাক্ষ, আর মোলারামের আঁকা ছবির মত উঁচু-নিচু 'ঝরোকা' অলিন্দ হাতওয়ালা সেকেলে ধরণের ছোট্ট বাড়ীর একটিতে নীতিশ থাকে। সামান্য মাহিনার একটি মীনা চাকর তার কাজ করে দিয়ে যায়। তার স্ত্রীও কখনো কখনো আসে, স্বামী অসুবিধার সময় না এলে। আর তখন তাদের ছোট ছোট শিশু বালক-বালিকা ছেঁড়া কাগজের ছবি, কাগজ, সিগারেটের রূপালি রাংতা, খেলা-ঘরের অমূল্য সম্পদ, কখনো কখনো দুটো একটা পয়সা নিতে আসে। আর আসে সেই সঙ্গে নগ্নপদ জীর্ণ আঙরাখা ও ঘুন্‌সীপরা কৌপীনবাস ছেঁড়া বস্ত্র খণ্ডে মাথা ঢাকা পাড়ার প্রতিবাসী বালক, নগ্নকায় শিশু, ছেঁড়া ঘাগরা ওড়না জামাপরা বালিকা। বাবুজীকে তারা ভয় করে না। বাবুজীর সঙ্গে বহু রকম গল্প করে তাদের নিজ ভাষায়। ওদের ভাষাজ্ঞানহীন নীতিশ সেই গল্প শোনে, আর ভাষা শেখে নিঃসঙ্কোচে। আর তারাও নিঃসঙ্কোচে তার ঘরের জঞ্জাল আবর্জনা ভাঙা কলম নিব, খালি দোয়াত, ছেঁড়া খবরের কাগজের ছবি, বিলিতি মাসিকের ছবি নিয়ে আসে। প্রাচুর্য্য বিলাসময় পরিবারের আওতায় পালিত, নানা বস্তুতে লুব্ধ ও মুগ্ধ অথচ বঞ্চিত

লাঞ্ছিত নিজের জীবনের কথা নীতিশের মনে পড়ে যায় ওদের দেখে। নীতিশের কি মনে হয়। তার পঞ্চাশ টাকা মাহিনা থেকে মাসের প্রথমে সে নিয়ে আসে সস্তা নানা রঙের লজঞ্জুস বিস্কুট। কখনো বা ছোট ছোট কম দামী দু' একটা জামা। কখনো স্কুলে-পড়া কারুর জন্য সস্তা বিলিতী ছবির বই একটা দুটা। সেদিন তাদের আনন্দময় কলরবের মাঝে সহসা নিজের বঞ্চিত নিষ্ঠুর শৈশবের শিশু নীতিশ যেন তার মন থেকে বেরিয়ে আসে, খেলা করে যেতে চায় সেই দলে। তার মনে হয়, সে আর তারা সবাই এক। কি একটা উন্মন দুঃখে তার মন ভরে ওঠে। যেন মনে হয় কি করা যেতে পারে,—কেন করা যায় না, কেন অতি সামান্য, যৎসামান্য, অতি নগন্য প্রয়োজনও ওদের মেটে না! অতি তুচ্ছ বস্তু পাওয়ার হাসিও ওদের মুখে কেউ ফোটায় না। কুখাদ্য খাওয়া, গাড়ীতে বসতে না পাওয়া, মনীশ প্রবীরদের বাল্য ঐশ্বর্য্যময় খেলাঘরের শুধু দর্শক ও সাথী, অপ্রতিভ লুব্ধ, সেদিনের বহু বঞ্চিত বালক আজকের নীতিশের মনের মধ্যে কি যেন গুঞ্জন করে—যার সেদিন বিস্ময়ের সীমা ছিল না, নির্বাক অভিযোগের শেষ ছিল না, কেন এমন হয়? কেন? কেন?

আজো তার মনের মাঝে সেই মূঢ় দর্শক 'বালক প্রতিকার-হীন কোন্ বিচারের' কথা ভাবে।

তারি মাঝে মাস কেটে যায়, বছর যায় ঘুরে। প্রতুলের মা, ভাই বোন, যমুনাবাঈদের বাড়ী, পল সাহেবের বাড়ী

ছাড়াও মিলের শ্রমিকদের ভাঙা কুঁড়ে, তাদের জীবনযাত্রা, ও অনাথ আশ্রমের অনেকের মুখ চেনা হয়, যেন পরিচয়ও হয়। আর বড় বড় শেঠদের ও রাজদরবারের চুনোপুঁটী কর্মচারীদের সঙ্গেও চেনা হয়।

ধনী দরিদ্রের, প্রাচুর্য্য অভাবের, সমস্ত ভেদই চিরদিনের মত সমান বার্তাই বয়ে আনে একইভাবে।

সন্ধ্যার পর নীতিশ প্রতুলের বাড়ী আসে।

একদিন প্রতুলের মা বল্লেন, 'আমার এক পিসতুতো বোনের মেয়ে আজমীঢ়ে চাকরী নিয়ে এসেছে কন্‌ভেণ্টের স্কুলে। সে আজ এসেছে। তাকে হয়তো তোমরা চেন। তোমাদের সুমিত্রা বৌদির বোন হয় সম্পর্কে।

সুমিত্রা বৌদিদের বা তাদের কোনো বোনের জন্য নীতিশের কোনো কৌতূহলই ছিল না আর, বরং যেন কি একটা বিতৃষ্ণা তার লুকোনো ছিল।

সে বল্লে, 'ও।'

বিনু মিনুর তখন গল্প ও খবর জোগাড় করার প্রতিযোগিতা চলেছে। পড়া খেলা আর সঙ্গীদের কাহিনী।

চৈত্রের সন্ধ্যা। আঙিনায় সতরঞ্চি পাতা দড়ির খাটে বসে গল্প হয়—মা রান্না করার অবসরে এসে বসেন।

প্রতুল নীতিশ বিনু মিনুর গল্প হয়। কখনো বই, কখনো স্কুল, কখনো মিল, কখনো প্রতিদিনের বাইরের জগৎ—এই গল্প।

বীণা এসে দাঁড়ালো তার মাসীমার পাশে।

প্রতুল বল্লে, 'তোর মনে নেই নিতু, এ সেই বুলুদের ইস্কুলের বীণা মুখুয্যে।'

নীতিশের মনে পড়ল, এ সেই বীণা যে জালিয়ানওয়ালা-বাগের কথা বলেছিল এবং যার আর একটা বড় পরিচয় 'কালো।'

প্রবোধ মুখুয্যের কালো মেয়ে বীণা! তৃতীয় পরিচয়, মাসীমার বোনঝি।

বিদেশীভাবে পরিচয় দেওয়া আর পরিচিত করে দেওয়ার প্রথা এখনো এদেশে কাগজের ফুলের মতই আড়ষ্ট ও মিথ্যে-ভাবেই আছে। সম্পর্ক দিয়ে পরিচয়ই এদেশে সোজা, আর চলে ভাল। কাজেই বুলুদের ইস্কুলের বীণা এবং মাসীমার বোনঝি এইটেই সোজা সহজ পরিচয়।

বাংলা দেশের কালো মেয়েটি নীরবে একটি নমস্কার করে মাসীমার কাছে বস্‌ল।

বিনু মিনুর বিশ্রম্ভালাপ, প্রতুল নীতিশের মৃদু স্বরে আলাপ আর মাসীমার বীণার ঘরোয়া প্রশ্নোত্তরে সন্ধ্যা শেষ হয়ে রাত্রি হ'য়ে গেল।

নীতিশ চলে গেল।

মাসী বোনঝি আর প্রতুল গল্প করেন।

মেয়েদের পরিচয়—হয় শুধু সম্পর্কেরই ইতিহাস, নয় পরিচয়হীন সম্পর্কহীন রূপবহ্নিবিলাসে পোড়ানো ও পুড়ে যাওয়ার কাহিনী, এ ছাড়া আর কোনো পরিচয়—মানুষের পরিচয় পৃথিবীর ইতিহাসে স্পষ্ট করে পাওয়া যায় না। চিরকালই হয় তারা সতী সীতা সাবিত্রী, নয়, উর্বশী বসন্তসেনা ক্লিয়োপেট্রার দলে। কিন্তু এই যুগে কোনো কোনো জায়গায় সে যুগ শেষ হয়ে গেছে। সেইখানে আধুনিক ব্যাকুল, আপনাকে খুঁজে ফেরা দু চারটি মেয়ের মাঝে বীণাও যেন একজন ছিল। ধনী দুহিতার সচ্ছল সমাদৃত পরিমণ্ডলে আর অস্পষ্ট ভাবনার, কল্পনার, আশার নীহারিকা মণ্ডলের মাঝে থাকতে থাকতেই তার বাপের মৃত্যু হ'ল।

সম্পর্কের পট পরিবর্তন হ'ল। অকস্মাৎ বীণা দেখতে পেল যেখানে সে নিশ্চিন্ত হয়ে এতদিন দাঁড়িয়েছিল সেখানে পায়ের নীচে আর সোনার বা মাটীর পৃথিবী নেই,—সেটা আকাশ, শূন্য। ভাই বোন আর এক বাপ মার সন্তান নয়, সহসা বাড়ীর আশ্রিত প্রসাদভিখারীর দলের মাঝে সে পড়ে গেছে যেন।

ভ্রাতৃ-বধূদের, তাদের সন্তানদের পাশে এখন বীণা তাদের অনূঢ়া পিসি মাত্র—কালো বলে যার বিয়ে হয়নি।

এম-এ, পাশ বীণা। পিতা বহু অর্থের প্রলোভনে লুব্ধ করে মনের মত জামাতা সংগ্রহের বহু চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তা মেলেনি।

বীণা চাকরী নিল মেয়েদের কোন্ কলেজে প্রফেসারী।

তাতে বাড়ীতে শান্তি থাকে না, কেননা মান থাকে না ভাইদের !

এতকথা মাসীমাকে বলে না।

তাঁর প্রশ্নের দু' একটা সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে বীণা একটু হেসে বল্লে ঃ

'জানো মাসীমা, একটা কালো কুৎসিত ছেলে যদি প্রফেসার হয়, তার দাম কিন্তু বিয়ের বাজারে কম হয় না।'

প্রতুল শুনছিল গল্প, বল্লে, 'বাঃ, বেশ বলেছ তো !'

মাসীমা বল্লেন, 'সত্যি।'

বীণা চুপ করে থাকে। তার মনে হয় দামটা কিসের ? টাকার তাহলে কি নয় ? একটা ছেলে প্রফেসারের টাকা আর মেয়ে প্রফেসারের টাকার দামের তফাৎটা কি ? মেয়েদের দাম শুধু তাকে একজন মানুষের দরকারে ? সমস্ত সম্পর্ক অতিক্রম করে মানুষ হিসেবে তার মূল্য নেই ? দরকার নেই ? পৃথিবীর কোনোখানে চিরদিনের ইতিহাসে একদিনো সে মানুষ হিসেবে পরিচিত হলনা কেন ?

মাসীমাও চুপ করেছিলেন, তারপর বল্লেন, 'তা শুনেছিলাম যে নলিনীর কাছে (বীণার মা) তোর নামে অনেক টাকা না বাড়ী রাখা আছে—বিয়ের জন্য, সেটা তো তোরই ?'

বীণা একটু চুপ করে থেকে তারপর বল্লে, 'জানিনা তো। বাবা তো কিছু বলেন নি।' টাকার কথা সে শুনেছিল আগে। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর জানা গেল সেকথা শুধু কল্পনাতেই

ছিল। সে দুহিতা, পুত্র নয়,—দোহনকারিণী এবং অতিরিক্ত! মাসীমা বল্লেন, 'তা এত দূর দেশে চলে এলি কেন, মার কাছে তো বেশ ছিলি?'

বীণা এবার হেসে বল্লে, 'দেখছি সম্পর্কের নাম খ্যাতিকে ছাড়িয়ে গিয়ে আমার নিজস্ব কিছু আছে কি না, আমার দাম আমার কাছে যদি কিছু পাই!' 'মার কাছে'র কথার জবাব দিতে পারল না।

মাসীমাও হাসলেন. 'বেশ বলেছিস্।'

প্রতুল অন্যমনে ওদের কথা শুন্‌ছিল, তার মনে হল, বীণার মনের সঙ্গোপন কোণে সম্পর্কের সম্বন্ধহীন যেন কে একজন একাকিনী নিঃসঙ্গ বীণা আছে—যে শুধু দর্শক। সে অবাক হয়ে সম্পর্কের পটভূমিকায় এই বীণাকে দেখছে। সে বীণা যেন পিতৃমাতৃ স্নেহকে সম্মান করে, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারে না। ভাইবোনের সম্পর্ককে মধুর মনে করতে চায়, কিন্তু সত্য মনে করতে পারে না। সে কি এরি মাঝে অস্পষ্টভাবেই পৃথিবীকে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেছে? মেয়েদের সমস্ত সম্পর্কের নীচে যেন অতল গহ্বর আছে, সত্য কিছু নেই,—জানতে পেরেছে? তাদের জীবন সবটাই প্রসাদ, প্রাপ্য কিছু নেই জান্‌তে পেরেছে? প্রতুল ভাবে, শুধু অর্থার্জনের অক্ষমতাই কি তাদের এত অসহায় করে রেখেছে? পৃথিবীর কোন্ প্রয়োজনীয়তার বিচারশালার মানদণ্ডে কাঞ্চন মূল্যে তাদের মূল্য নির্ণয় হচ্ছে চিরদিন ধরে?

১৩

দেওয়ালীর ছুটি এবং উৎসব এসে পড়ল।

বীণা এলো মাসীর বাড়ী, রুথ এলো নিজের বাড়ী।

শ্রুতি পরিচয় হয়েছে নীতিশ ও প্রতুলের মুখে পরস্পরে। এবারে ভালো করে চেনা শোনা হ'ল দীপাবলির আলো ঝলমল সহর দেখতে গিয়ে। জননীরা বেরুলেন না।

রুথ বল্লে, 'চলুন মিস্ মুখার্জি, আমাদের দেশের দেওয়ালী আপনাদের দেখিয়ে আনি।'

উঁচু-নিচু টিলা ও পাহাড়ে-ভরা ছোট্ট সহরের পথ, ধনী দরিদ্রের মাটীর প্রদীপ ও রঙীন আলোর উৎসবে আর বিচিত্র বসনভূষণে ভূষিত নরনারী বালক বালিকাতে ভরে গেছে। বাজার দেওয়ালীর ঝক্‌ঝকে বাসন আর রঙীন খাবারে ভরা। দেওয়ালীতে বাসন কেনা আর খাবার ভেট দেওয়া দেশের প্রথা।

রুথ কিন্‌ল চামচ, বল্লে, 'মা-রা তো হিন্দু, কিনি কিছু বাসন,—তা চামচই আমাদের দরকার আছে।'

মা-রা হিন্দু শুনে বীণা অবাক হয়ে চুপ করে রইল।

রুথ বল্ল, 'চলুন ফেরত পথে আমাদের বাড়ী। আজ দেওয়ালীর 'গজ লক্ষ্মী' পুজো মাসীমা করবেন, প্রসাদ খেয়ে আসবেন।'

বাংলা দেশের বিজয়ার উৎসবের মত দেওয়ালীতে মিষ্টি খাওয়ানো আর খাওয়া পশ্চিমের প্রথা।

বাহির দুয়ারে বেশী প্রদীপ জ্বলছে না, দুটি মাটির প্রদীপ মাত্র জ্বালা আছে।

অন্তঃপুরে গঙ্গাবাঈয়ের ঘরের পর্দা আজ তোলা। নীতিশরা সেখানে এসে দাঁড়াল।

গঙ্গাবাঈয়ের শোবার ঘরের একপাশে একটি ছোট্ট চৌকীর ওপর রেশমের চাদর পেতে লক্ষ্মীর আসন করা হয়েছে। চৌকীর মাঝখানে ফুলের মালাতে সাজানো মা; লক্ষ্মীর ছবি। দু পাশে দুটি মাটীর সাদা হাতী, তার পিঠে উঁচু হাওদা, হাওদার চারিদিকে ছোট ছোট মাটীর প্রদীপ করা। তাতে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বেলে দিয়েছেন। আশে-পাশে দীপ ধূপ জ্বালা, থালাভরা চিনির খেলনা, মঠ কদ্‌মা বাতাসা আর বরফি কলাকন্দ চারিদিকে সাজানো। শিউশরণ পল সাহেব, মোহনলাল এবং রুথ এসে দাঁড়িয়েছিল।

গঙ্গাবাঈ পূজা করছিলেন, অনেক লোকের আগমনে একবার পিছন ফিরলেন। মুখের ভাব যেন নির্লিপ্ত কঠিন। পূজারিণীর মত নম্র বা কোমল নয়,—নীতিশের মনে হল। —যেন ভিতরে অশান্ত।

রুথ বীণাদের বল্লে, 'জুতো খুলে আপনারা ভিতরে যান, মাসীমা আমাদের যাওয়া পছন্দ করবেন না।'

নীতিশ বীণা প্রতুল জুতা খুলল, কিন্তু ভেতরে গেল না। সঙ্কুচিত ভাবে সকলেই বাইরে দাঁড়িয়ে রইল।

পূজারীব্রাহ্মণহীন, অঙ্গহীন, আনুষ্ঠানিক পুজো শেষ হ'ল। যমুনাবাঈ চন্দন ঘষছিলেন, মালা সাজাচ্ছিলেন—বোনের পূজোর যোগাড় দিচ্ছিলেন।

এবারে গঙ্গাবাঈ প্রসাদ নিয়ে এলেন। টেবিলের ধারে ছোট ছোট চায়ের প্লেটে বাতাসা, মঠ, বরফি, কলাকন্দ, ঘিওর সাজানো হ'ল। যমুনাবাঈ সকলকে দিলেন।

সহসা পল সাহেব বল্লেন, 'আমার একটু কাজ আছে আমি উঠি।'

মোহনলাল বল্লেন, 'সেকি, একটু মিষ্টি খাও?'

শিউশরণ বল্লেন, 'মিষ্টি আর একদিন খাব,—আর মিষ্টি আমার ভাল লাগেনা। আজকে দেরী হয়ে যাবে, যাই।'

শিউশরণ চলে গেলেন।

গঙ্গাবাঈয়ের পুজো শেষ হয়েছিল। তিনি এসে দাঁড়ালেন হাতে প্রসাদী ফুলের মালা দুটি। বল্লেন, 'বাবুজী তোমরা ব্রাহ্মণ, আমার মালা দুটি নাও। ভাল হাতে পড়ল মালা।'

রুথ হেসে বল্লে—'মাসীমা, আমরা পাব না?'

গঙ্গাবাঈও হাসলেন, বল্লেন, 'তোমরা কি ঠাকুর পূজোর মালা ভক্তি করে নেবে?' তার পরেই টেবিলে চেয়ে বল্লেন, 'শিউশরণ ছিলনা? কোথায় গেল? প্রসাদের ভয়ে বুঝি পালালো।'

মোহনলাল বল্লেন, 'সে কি কাজ আছে বলে চলে গেল।'

গঙ্গাবাঈ একটু চুপ করে রইলেন, তারপরে বল্লেন, 'সে প্রসাদ নেবেনা বলে চলে গেল। আজকে বাইরের ওদের না আনলে পারতে তোমরা! এ পূজো তো শুধু আমাদের দুই বোনের, এতে তো আর কেউ নেই।'

মোহনলাল অপ্রস্তুতভাবে বসে রইলেন।

জননীদের পুরুষানুক্রমিক ধর্ম কুলগত প্রথার সঙ্গে ধর্মান্তর গ্রহণকারী ছেলেমেয়ের যুক্তি বা বুদ্ধির দিক দিয়ে বিরোধ ছিল কি না বলা যায় না কিন্তু তারা নীরব দূরত্বে সম্ভ্রমে মায়েদের ধর্মের আচার অনুষ্ঠানকে কিছুটা মেনে, কিছু এড়িয়েই চলত। জননীদেরও যেন নিরুপায় ক্ষোভের অন্ত ছিল না। অসহিষ্ণু গঙ্গাবাঈ অকারণেই কঠোর মন্তব্য করতেন ছেলেমেয়েদের ওপর। ভুলে যেতেন এই ধর্মান্তরগ্রহণ তারা স্বেচ্ছায় করেনি। যমুনাবাঈ চুপ করেই থাকতেন।

কিন্তু বিপদ এলো গোঁড়া ক্রিশ্চান বন্ধুদের নিয়ে। যারা ঠাকুর পূজো আর অন্য কোন ধর্মকে নিরপেক্ষ দৃষ্টি ও দূরত্ব দিয়ে মেনে নেয় না। যাদের পরমত সহিষ্ণুতা নেই গঙ্গাবাঈয়ের মতনই।

বাসি দেওয়ালী। সন্ধ্যাবেলায় দু' চারটি করে মাটীর প্রদীপ জ্বলেছে সকল ঘরে নিয়ম মত। গঙ্গাবাঈয়ের শোবার ঘরের ওপাশে ঠাকুরের ঘরেও প্রদীপ জ্বলেছে।

নীতিশ এলো। বাড়ীতে মোহনলাল রুথ কেউ নেই। প্রতুলও আসেনি।

গঙ্গাবাঈ যমুনাবাঈ পরম স্নেহে ও সমাদরে তাঁদের ঘরে নিয়ে গেলেন নীতিশকে। বল্লেন, 'আস্থন বাবুজী আমাদের পুজোর ঘর দেখে যান।'

নীতিশ জুতো খুলে এক পাশে গিয়ে বসল।

ছোট্ট তামার পেটা পেতলের ওদেশী ঘড়ায় বোধ হয় গঙ্গা বা যমুনার জল রয়েছে একটি তাকে। শ্রীনাথজী, গোপালজী, রাধাগোবিন্দ, মহাবীরের, রামসীতার ছবি সাজানো আছে তাকে। পূজোর তামার কোশাকুশী, পঞ্চপ্রদীপ, পানিশংখ পুষ্পপাত্র, ধূপদানী ও পিলসুজও রয়েছে। ঝক্‌ঝকে করে সব মাজা—মনে হয় প্রত্যহ নিয়মিত পুজো করেন। কয়েকখানি বই,—গীতা, রামায়ণ, মহাভারতই বোধ হয়।

'বাবুজী, সরবৎ খাবেন প্রসাদী 'ওলার'?' গঙ্গাবাই জিজ্ঞাসা করলেন। 'ওলা' চিনির ডেলা বা নাড়ু।

নীতিশ বল্লে, 'সরবৎ আর সন্দেবেলা খাবনা, চা খেয়েছি খানিক আগে।'

গঙ্গাবাঈ বল্লেন, 'প্রসাদে না বলতে নেই, একটু নিন।'

নীতিশ হাতে করে সামান্য ভেঙে নিল। প্রসাদের ওপর নিষ্ঠা তার আধুনিক ছেলেদের মতই নির্লিপ্ত, কিন্তু গোঁড়া হিন্দু বাড়ীর ছেলে বলে সবই মেনে নিতে অভ্যস্ত ছিল।

হঠাৎ গঙ্গাবাঈ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি শুদ্ধি বিশ্বাস করেন ?'

নীতিশ অবাক হয়ে বল্লে, 'শুদ্ধি ?'

হ্যাঁ, এই ক্রিশ্চানের বা ধর্মান্তরিতের আবার নিজ ধর্মে ফিরে যাওয়া।'

নীতিশ একটু চুপ করে রইল, তারপর বল্লে, 'সেতো নিজের ব্যক্তিগত মত গঙ্গাবাঈ। আমি তো ধর্মান্তরিত নই সুতরাং আমি সে মনোভাব বুঝতে পারব না।'

গঙ্গাবাঈ যমুনাবাঈয়ের দিকে একবার তাকালেন, তারপর সহসা বল্লেন, 'আমরা ভাবছি রুথকে শুদ্ধি নেওয়াব, আপনার কি মনে হয়?'

নীতিশ আশ্চর্য্য হয়ে গেল। এরকম ঘরোয়া প্রশ্নে তার মতামতের কি দরকার বুঝতে পারে না। সে কি বলবে যেন ভেবেই পেল না, বল্লে, 'সেতো কাবেরীবাঈ সাবালিকা হয়েছেন, বড় হয়েছেন, তিনি বুঝবেন, তিনিই মতামত দিতে পারেন। মোহনলালজী কি বলেন? তিনিও শুদ্ধি গ্রহণ করবেন?'

গঙ্গাবাঈ উষ্ণভাবে বল্লেন, 'না, সে গোঁড়া খৃস্টান, সে শুদ্ধি নেবে না, সে বিশ্বাসই করে না। রুথও জানেনা, তবে সে মেয়ে, সে রকম হতে পারে। তাহলে তার বিয়ে আমরা ব্রাহ্মণের ঘরে দিতে চেষ্টা করব।'

সমস্ত কথাবার্তা একেবারে ঘনিষ্ঠ পারিবারিক সীমায় এসে পড়েছে বলে মনে হয় নীতিশের। সে অপ্রস্তুত হয়ে যাচ্ছিল, বল্লে, 'বেশ তো।'

এবারে গঙ্গাবাঈ বল্লেন, 'বাবুজী আপনি তো ব্রাহ্মণ,

কিন্তু গোঁড়া নন। আমরা যদি রুথকে আপনাকে দিই, আপনি তাকে গ্রহণ করবেন ?'

যমুনাবাঈ অবাক হয়ে বোনের দিকে চাইলেন। নীতিশও হতবুদ্ধির মত ওদের দিকে চেয়ে রইল। তার মুখে যেন কোনো কথাই এলো না খানিকক্ষণ।

তারপর বল্লে, 'কিন্তু আমি যেন শুনেছি শিউশরণজীর সঙ্গে তাঁর বিয়ের কথা আছে।'

গঙ্গাবাঈ তিক্তভাবে বল্লেন, 'সে প্রস্তাব করে যদি তাকে আমরা জবাব দিয়ে দোব। আপনি জানেন তো সে ব্রাহ্মণ নয় ? আপনি বিয়ের মত করলে আমরা রুথকে সেই কথা বলে শুদ্ধি নেওয়াব। আপনার কি ওকে ভাল লাগে না ? ওতো দেখতেও ভালো।'

নীতিশ অপ্রতিভ লজ্জায় ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌ল, বল্লে, 'হ্যাঁ, উনি খুব ভাল মেয়ে, কিন্তু আমি বিয়ের কথা তো ভাবিনি।'

রূঢ়ভাবে তিনি বল্লেন, 'তাহলে আপনি এখানে আর আসবেন না। আপনি জাত মানেন তাই বিয়ে করতে পারবেন না ?'

নীতিশ বল্লে, 'জাত আমি মানি কিনা জানিনা কিন্তু বিয়ে-করার কথায় আমাকে ক্ষমা করুন।'

নীতিশ নমস্কার করে চলে গেল।

১৪

পরদিন গঙ্গাবাঈ কোথায় বেরিয়েছিলেন অথবা পূজাপাঠে ব্যস্ত ছিলেন।

যমুনাবাঈ রুথের কাছে বল্লেন ঘটনাটা।

রুথ অবাক হয়ে চেয়ে রইল। কথাটা যেন বুঝতে তার দেরী হতে লাগল।

যমুনাবাঈ হাতের বোনাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন। ক'টি ঘর তুলতে হবে, কিম্বা ফেলতে হবে তাঁর মনে হচ্ছিল না ঠিক। অস্বস্তির যেন সীমা ছিল না।

রুথ সাম্‌লে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'মা, আমি কি এখনো ছোট মেয়ে আছি?—হিন্দুঘরের মত সম্বন্ধ করে আমাদের কোনোদিন বিয়ে হবে, না, হিন্দুঘরের ব্রাহ্মণের ছেলেকে আমাকে বিয়ে করতে বল্‌লেই সে করবে? তোমরা কি ভেবেছিলে? ছি! ছি! বাবুজীর কাছে আমার মুখ আর রাখলে না। কি রকম সরমে আমাকে ফেল্‌লে বলতো? আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করতে পারতে?'

যমুনাবাঈ শান্তভাবে বল্লেন, 'আমি জানতামই না একথা উঠবে,—গঙ্গাবাঈ হঠাৎ বললেন।'

রুথ নিষ্ঠুরভাবে রেগে গিয়েছিল, সে বল্লে, 'তোমরা

কোনো দিন আপনাদের মধ্যে একথা বলাবলি করনি ? নইলে মাসীজী কেন বলবেন ?'

যমুনাবাঈ অপ্রস্তুত হয়ে বল্লেন, 'বাবুজীকে আমাদের খুব ভাল লেগেছিল, আর ভেবেছিলাম উনি বেশী জাতের বিচার করেন না। তাই নিয়ে আমরা একটু কথাবার্তা কয়েছিলাম কিন্তু এত কথা গঙ্গাবাঈ বলবেন আমি জানতাম না।'

যমুনাবাঈ কিছুক্ষণচুপ করে থেকে বল্লেন, 'পল সাহেবের তোমার ওপর ঝোঁক রয়েছে, সেইজন্যেই বোধহয় বলে ফেল্লেন।'

রুথ কঠিন মুখে জননীর দিকে চেয়েছিল, বল্লে, 'পল সাহেবকে তোমাদের অপছন্দের কথা আমি জানি। আর উনি যে ব্রাহ্মণ বা উঁচু বর্ণের নন, সেইটেই তোমাদের বাধছে সেও জানি। কিন্তু তাই বলে তো ক্রিশ্চান হয়ে জাত বিচার করা চলে না, কিম্বা শুদ্ধি করে হিন্দু বিয়েও সোজা হবে না। আমি শুধু বলছি, আমার বয়স হয়েছে। আমি যে সমাজের যে ধর্মের আওতার রয়েছি তাতে তো তোমাদের মতামত পুরো মানা-না-মানা আমারি ওপর নির্ভর করে। তোমরা তোমাদের পছন্দ, ভালো লাগা-না-লাগা আমাকে জিজ্ঞেস করে কথা কইলে না কেন ? আমিও ছোট হয়ে গেলাম বাবুজীর চোখে, আর তোমরাও বড় হলে না। বিয়ের সম্বন্ধ ছাড়া যেন তোমরা আর কোনো কথাই জাননা।'

রুথের রাগে ক্ষোভে চোখে জল এসে গেল। সে নিজের ঘরে চলে গেল। যমুনাবাঈ বোনার কাঁটাতে অনেক ভুল ঘর তুলেছিলেন, খুলতে লাগলেন।

রুথ-ও ঘরে স্যুটকেশ গোছাতে লাগল। তাকে কাল নাসিরাবাদ যেতে হবে। তার ছুটী ফুরিয়েছে।

মোহনলাল আর গঙ্গাবাঈ ফিরলেন।

মোহনলাল জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি যাবার গোছ করছ নাকি?'

রুথ বল্লে, 'হ্যাঁ ভাইজী।'

ঘরের আবহাওয়া যেন থমথম করছিল। মোহনলাল ভাবলেন যমুনাবাঈয়ের মন কেমন করছে।

মোহনলাল বোনকে বল্লেন, 'শিউশরণ তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, কি কথা আছে।'

বাইরের ছোট ঘরখানি। মোহনলালের পড়াশোনা বিশ্রাম শোওয়া সব ঐ ঘরটিতেই।

মোহনলাল আর রুথ এসে দাঁড়ালেন।

শিউশরণ জানলার ধারে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। শিউশরণের মুখটা যেন ম্লান চিন্তিত।

মোহনলাল বল্লেন, 'বসুন, পল সাহেব।'

শিউশরণ বল্লেন, 'হ্যাঁ বসি।'

তারপর বল্লেন, 'আমি একটা ভাল কাজ পেলাম বোম্বাইয়ে, সামনের সপ্তাহেই সেখানে যেতে হবে, পরশু যাচ্ছি।'

—'সে-কি?' মোহনলাল আর রুথ দুজনেই অবাক হয়ে এবং খুসী হয়ে বল্লে, 'কবে পেলেন? ঠিক ছিল না? আগে তো বলেন নি?'

'না, 'অনেক দিন ধরেই চেষ্টা করছিলাম। ভাবছিলাম পাব না, তা পেয়ে গেলাম। সরকারী চাকরী। আর সুযোগ না ছেড়ে এখানে শুধু সাহেবকে বলেই চলে যাচ্ছি—ওকে আগেই বলা ছিল। আমার ছুটি পাওনা ছিল কিছু, সেইটেই এই সময়ে কাজে লাগল।'

রুথ মোহনলাল দুজনেই খুব খুসী হ'ল।

মোহনলাল বল্লে, আবার ফিরবেন নাকি ছুটী হ'লে-টলে? না একেবারে এ দেশ ছেড়ে দিলেন?'

শিউশরণ বল্লেন, 'হ্যাঁ, 'আসব বৈকি আবার। দেখি কত দিনে ছুটী দেয়,—আর কোথাও বদলি করে কি না।'

তারপর বল্লেন, 'ততদিনে মিস্ মিশ্রও তো ডাক্তার হয়ে বেরিয়ে যাবেন বোধহয়। আপনারাও এ দেশে থাকলে হয় তখন!"

মোহনলাল বল্লেন, 'আমি থাকবই বোধহয়। তবে কাবেরী তো চাকরী করবে, 'কি বলিস্?'

রুথ হাসলে, বললে,—'চাকরী করবই, প্রাইভেট প্রাক্‌টিস্ করব আমার সে টাকা কই। যাই হোক, আমরা এই আজমীঢ়, মারওয়াড়া, কিষণগড় এইসব জায়গায়ই আছি। খুঁজে পাবেন।'

কথায় কথায় সন্ধ্যা শেষ হয়ে গেল। যমুনাবাঈ একবার

এসে দাঁড়ালেন। বিদেশে চাকরী হয়েছে শুনে যেন খুবই খুসী হলেন। বেচারী পল সাহেব অতটা খুসীর কারণ বুঝতে পারলেন না—ভাবলেন উন্নতির জন্য।

তার পরদিন সকালে শিউশরণকে খাবার কথা বললেন যমুনাবাঈ।

পরদিন যথা-সময়ে সহজ আনন্দে কথালাপে সকলের খাওয়া-দাওয়া আর পল সাহেবের বিদায় নেওয়া হয়ে গেল।

রুথও বিকালের ট্রেনে নাসিরাবাদ চলে গেল।

পরদিন শিউশরণকে ট্রেনে তুলে দিতে এলেন মোহনলাল। শিউশরণ অন্যমনস্কভাবে কি যেন একটা কথা ভাবছিলেন।

সহসা বল্লেন, 'আপনার কি মনে হয় আমার চাকরীটা ভাল হ'ল—'

মোহনলাল বল্লেন, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়।'

সিগ্‌ন্যাল তখনো পড়েনি, দেরী রয়েছে, হয়ত গাড়ী 'লেট' আসছে।

শিউশরণ বল্লেন, 'আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ভাবি, করা আর হয়নি। আজ তো চলেই যাচ্ছি।'

মোহনলাল বল্লেন, 'কি বলুন না?'

শিউশরণ বল্লেন, 'আমি এ চাকরী নিলাম, এতে পরীক্ষা দিয়ে উন্নতি আছে। অনেকদিন ধরে ভাবছিলাম মিস্ মিশ্রের মাকে জিজ্ঞাসা করব আমার সঙ্গে মিস্ মিশ্রের বিয়ে দিতে পারেন কি না। আপনাকেও জিজ্ঞাসা করব ভেবেছিলাম।

কিন্তু স্কুলের চাকরীতে সামান্য মাহিনা, ভরসা করিনি। যমুনাবাঈকে এখন কি বলব একথা? অবশ্য কিছুদিন পরে, কাজটা পাকা হলে বা একটা পরীক্ষা দিয়ে উন্নতি হলে—কি মনে হয় আপনার? ওখান থেকে তাহলে চিঠি লিখব?'

মোহনলাল একটু চুপ করে রইলেন, তারপর বল্লেন, 'বেশ তো বলবেন, বলতে ক্ষতি কি।'

'আপনার মনে হয় ওঁরা মত দেবেন? মিস্ মিশ্রকে বুঝতে ঠিক পারি না, তবে তাঁর হয়ত অমত হবে না মনে হয়। কিন্তু আপনার মাকে আর মাসীমাকে আমার ভয় করে।' শিউশরণ লজ্জিতভাবে হাসলেন।

মোহনলালও হাসলেন ভয় করার কথা শুনে। মাকে তাঁরও ভয় কম নেই। রাশভারি, গম্ভীর রাগী মেজাজের জননীকে তাঁরই ভয় করে এখনো। কখন কাকে স্পষ্ট কথা বলে দেবেন বোঝা যায় না, কখন কার উপর কি জন্য রাগ করবেন জানা যায় না। যেন তাঁর মনের মধ্যে সমুদ্র-তরঙ্গ সমস্তক্ষণ তোলা-পাড়া করছে, যার শেষ নেই শান্তি নেই। কিসের এ অশান্তি কেউ বুঝতে পারে না। ছোটবেলায় মোহনলালও বুঝতেন না, এখন যেন মনে হয় একটু বুঝতে পারেন। সম্প্রতি নীতিশের ঘটনাটা মাসীর কাছে শুনে সব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর কাছে—কিসের এই দুঃখ, এই বেদনা, এই ক্ষোভ। তাঁদের মনের কোনো আশ্রয় নেই, অবলম্বন নেই। যে ধর্মকে তাঁরা এখনো আঁকড়ে ধরে আছেন সে ধর্ম

ও সমাজ তাদের কোনো আশ্রয় দিতে পারেনি। দেবেও না। আজকাল কোথাও কোথাও শুদ্ধির খবর শুনে তাঁদের মনে আশা জেগেছে, যদি আজ শুদ্ধি গ্রহণ করে ছেলেমেয়েকে নিয়ে আবার তাঁরা সমাজ তথা সমাজান্তর্গত সংসার পান। তারপর বহুদিন পরে কালক্রমে হয়ত সকলে ভুলে যাবে এই পুরানো কথা। কিম্বা হয়ত তাদের নিয়েই নতুন সমাজ গড়ে উঠবে। বিলাতফেরৎ আর্য্য-সমাজীদের মতই মিশে যাবে। এই হয়ত জননীদের গোপন ও ব্যাকুল আশা। এই জন্যই এই আকস্মিক প্রস্তাব নীতিশের কাছে।

কিন্তু একথা শুধু মোহনলাল ভেবেছেন, তাঁরা ওদের ভাই-বোন দুজনকে বলতে সাহস করেন নি। নীতিশ যদি সম্মত হ'ত—তাহলে হয়ত তাঁরা ওদের বলতেন।

শিউশরণও চুপ করে ভাবছিলেন। মোহনলাল কিছুতেই একথা বলতে পারলেন না তুমি ব্রাহ্মণ নও, উচ্চ বর্ণের খৃস্টান নও, সেই জন্যই তোমার প্রস্তাব গৃহীত হবে না। আমরা খৃস্টান হলেও আমাদের মায়েদের জাতের মোহ আছে। হয়ত ছোট কথায় বলা যেত, যে মাসীমা রুথের অন্যত্র সম্বন্ধ করেছেন। কিন্তু এতো ছোট বয়সের বিবাহ নয়, আর রুথকে যদি জিজ্ঞাসা করে মত পায় শিউশরণ—।

মোহনলাল একটু হেসে বল্লেন, 'মাকে আমারি এখনো ভয় করে। তা হোক আপনি বলে দেখবেন।'

ট্রেন এসে পড়বার উপক্রম হ'ল। মোহনলাল শিউশরণ

কোন্‌খানে কোন ক্লাস দাঁড়াবে কুলীর সঙ্গে তাই নিয়ে কথা কইতে লাগলেন।

শিউশরণকে তুলে দিয়ে ফিরে এসে রাত্রে যমুনাবাঈয়ের সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন মোহনলাল। দুই বোনের পুত্র কন্যারই দুই মাসীর সঙ্গে কেমন করে বেশী ঘনিষ্ঠতা হয়ে ছিল। গঙ্গাবাঈ ভালবাসতেন প্রশ্রয় দিতেন রুথকে, যমুনাবাঈ স্বভাবতই শান্ত প্রকৃতির ধীর স্বভাবের, তিনি মোহনলাল রুথকে প্রায় সমানই প্রশ্রয় দিতেন তবু ছেলে বলে যেন বেশী একটু মোহ ছিল মোহনলালের ওপর। দিদির মেজাজের ওপর ভরসা ছিল না কারুরই, ছেলেমেয়েরাও ভয়ে ভয়ে চল্‌ত, যমুনাবাঈও। শুধু রুথই মাঝে মাঝে হেসে হেসে মাসীমাকে সত্যাসত্য দুচারটে কথা বলে দিত। গঙ্গাবাঈও তখন হাসতেন। একবাড়ীর মধ্যেও তাঁদের জাতি-বিচার যেন মোগলবাদশার হিন্দু বেগমের অন্তঃপুরের মত। নানা রকম করে ঠাকুর-দেবতা ছোঁয়াছুঁয়ি বিচার করে চল্‌ত। অথচ পরম প্রিয়জন, দুজনেরই একমাত্র করে সন্তান, দুজনই বিধর্মী। যাদের নিয়ে সব ছেড়ে আসতে হ'ল, সর্বত্যাগী হলেন, তবু ধর্মের প্রাচীর চিরকালের ব্যবধান রেখে দিলে যেন।

যমুনাবাঈ কি একটা বই পড়ছিলেন। গঙ্গাবাঈ কোথায় 'কথা' শুনতে গিয়েছিলেন, কার্তিক মাস কোনখানে 'কথা' হচ্ছিল। অনেক দূরে একপাশে কোণের দিকে বসে তিনি কত কথা-কাহিনীর সঙ্গে ভক্ত নর্সীর, যবন হরিদাসের অস্পৃশ্য

ভক্তদের কাহিনী শোনেন ব্যাকুলভাবে যাদের ধর্ম এক করে দিলে, তবু জাত রয়ে গেল। কথক মাঝে মাঝে কবীর দাদুর ভজন গান করেন, শোনেন। বড় বড় মন্দিরের কথার মাঝে গঙ্গাবাঈ যেতে ভরসা করেন না, দূর থেকে দর্শন করে আসেন। নয়ত সামনের সিঁড়িতে বসে থাকেন।

মোহনলাল বল্লেন, 'মা ফেরেননি? কোথায় গেছেন? তুমি যাওনি?'

যমুনাবাঈ বল্লেন, 'নর্সী ভকতের কাহিনী কথা হবে আজ বুড়ো শিব মন্দিরের আঙিনায়। রাত হবে, দুজনে গেলে চলবে না, তাই আমি আজ গেলাম না।'

মোহনলাল এটা-সেটা বই রাখতে গোছাতে লাগলেন।

যমুনাবাঈ হঠাৎ বল্লেন, 'রুথ বলে গেল এবারে বড়দিনের ছুটীতে ও আসবে না, ওর পড়ার চাপ পড়েছে।'

মোহনলাল বল্লেন, 'তাতো পড়বেই, ওর যে এবারেই বেরুবার কথা।'

যমুনাবাঈ বল্লেন, 'হ্যাঁ, তার চেয়ে বেশী হয়েছে ওর রাগ। অপ্রস্তুত হয়েছে। এখানে এলে যদি বাবুজীর সঙ্গে দেখা হয়।'

মোহনলাল বল্লেন, 'হ্যাঁ তাও বটে! তা সবটা শুনলাম না। কেন তোমরা ওকথা বাবুজীর কাছে বললে? বাবুজী কি কিছু বেশী ঝোঁক দিয়েছিলেন রুথের ওপর?'

'না, সেসব কিছুই নয়। বাবুজী জাত-টাত তেমন মানেন না আমাদের এ দেশের মত, আর বেশ ভাল ছেলে। গঙ্গাবাঈ

জানতো, শিউশরণকে পছন্দ করেন না মোটে। বাবুজী ব্রাহ্মণও, তাই হঠাৎই গঙ্গাবাঈ কথা বলে ফেললেন।'

'তারপর, বাবুজী কি বল্লেন?'

'তিনি আর কি বলবেন, ঐ জবাব দিলেন, তোমাকে তো বলেছি সেদিন।' মোহনলাল চুপ করে রইলেন।

তারপর বল্লেন, 'আজকে শিউশরণ যাবার সময় বলে গেল ও তোমাকে চিঠি লিখবে রুথের জন্য। আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আমি কি বলি। একবার ভাবলাম বলে দিই, তুমি অন্য জায়গায় ঠিক করেছ, তারপর ভাবলাম রুথের মন তো জানি না। বললুম লেখ না, দোষ কি?'

চকিত হয়ে যমুনাবাই বল্লেন, 'বললে সে?—আমি জানতাম সে বলবে। কি মুস্কিল হবে বলত, কি বলব ওকে?'

মোহনলাল বল্লেন, 'তুমি কি আর বলবে, রুথকে বোলো সে যা বলে তাই হবে।'

যমুনাবাঈ ব্যাকুল হয়ে বল্লেন, 'সে যদি মত করে?'

মোহনলাল হাসলেন, বল্লেন, 'অনিচ্ছায় ক্রিশ্চান না হয়েও ক্রিশ্চানের মত' হয়ে গেলে। আর কেন ভাবছ, কোনো কিছু কি তোমার ইচ্ছেতে হবে না হচ্ছে?'

গঙ্গাবাঈ এসে পড়লেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হচ্ছে কার ইচ্ছেতে?'

মোহনলাল হেসে বল্লেন, 'এই তোমাদের দুঃখের কথা হচ্ছে। কি করে বিধর্মী ছেলে মেয়ে নিয়ে বে-কায়দায় পড়ে গেছ।'

মেজাজ ভাল ছিল, গঙ্গাবাঈও হাসলেন, বল্লেন, 'তাতো পড়েছিই।'

যমুনাবাঈ এবারে বলে ফেললেন, 'শিউশরণ মোহনকে রুথের কথা বলে গেছে, আমাদের মত চায়। চিঠি দেবে।'

মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। গঙ্গাবাঈ কঠিন হয়ে গেলেন। অনেকদিন ধরে তাঁদের এই ভয়ই ছিল। এখন কি উত্তর দিয়ে এই অবাঞ্ছিত প্রস্তাবকে ঠেকানো যাবে!

মোহনলাল বল্লেন, 'মা, আমি শুনেছি বাবুজীকে বলেছ যা। কিন্তু আমরা ক্রিশ্চান, আমরা জাত মেনে চলব কি করে? তা ছাড়া ব্রাহ্মণতো ঐ রামদাস বাবাজীও, ঐযে মন্দিরে জল তোলে, পরিষ্কার করে। ব্রাহ্মণতো সবাই এক রকম নয়। যেমন শিউশরণজী সূত্রধর বলেই সত্যিই একেবারে ওদের জাত-ভাইদের সবারির মত নয়। আমি বলছি না যে ওখানে বিয়ে হোক রুথের, আমি বলছি জাতের মধ্যেও রকমের কথা। ব্রাহ্মণও জ্ঞানী হয়, পণ্ডিত হয়, সন্ন্যাসী হয়; আবার মূর্খ হয়, ভিখারী হয়, নীচ হয়, ছোট কাজ করে, দেখনি কি? ও লেখাপড়া শিখেছে, বিদ্বান, বুদ্ধিমান। তুমি জাত ব্রাহ্মণ হলেই বিয়ে দিতে কি?'

গঙ্গাবাঈ একটুখানি চুপ করে রইলেন। তারপর তিক্ত নির্লিপ্ত মুখে যমুনাবাঈয়ের দিকে চেয়ে বল্লেন, 'তা বেশ তো ওখানে তোমরা মত দাও।'

পর মুহূর্তেই যেন মনে হল, তাঁর চোখে জল এসে গেল, যে

দুর্বলতা তাঁর সহজে দেখা যায় না। তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। নিজেদের জীবন গেছে, সন্তানদের জীবনও অতিক্রম করে কতদূরে সমস্ত চলে যাচ্ছে যেন। যেন তাঁদের সহিষ্ণুতার বাইরে।

মোহনলাল আর যমুনাবাঈ চুপ করে হাতের খোলা বইয়ের দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন।

ইচ্ছে করলেই চাকরী ছেড়ে চলে যাওয়া যায় না। তারপর স্কুলের কাজ, অনেকগুলি ছেলে, অনাথ ছেলেরাই বেশী, প্রোমোশন পাবার মুখে পড়ার অসুবিধা করে নীতিশ যাবার কথা বলেই বা কি করে। মোহনলালের সঙ্গে রোজ দেখা হয়—শিউশরণ চলে গিয়ে কাজের চাপও পড়েছে। কিন্তু মনের মধ্যে যেন কি অস্বস্তি ভাব আছে। এখনো তিন মাস, অন্ততঃ জানুয়ারী অবধি কাজ করতে হবে।

নীতিশ ভাবে, তারপর ? তারপর কোথায় যাবে ? আচ্ছা নাই-বা গেল ! কিন্তু কি করে রুথদের বাড়ী বাদ দেবে ! স্কুলের ছেলেগুলির ওপর যেন মায়া পড়েছে। বাড়ীর আশ-পাশের শিশুগুলিও কম টানেনি। তারাই তো ওর সত্যিকারের সঙ্গী। সবাইকে ছেড়ে আবার কোথায় কোন্ কাজে কোন্ দেশে যাবে কে জানে ! ছেঁড়া আঙরাখাপরা কজোড়লাল ('কজোড়া' অর্থে ধূলাময়লা, 'হারামরা' জননী সন্তান বাঁচানোর জন্য ফেলারাম নামের মত কজোড়লাল নাম রেখেছে) ওকে দেখলে ছুটে আসে, 'বাবুজী গোলী' (লজঞ্জুস্)। সঙ্গে সঙ্গে

পাড়ার ছোট ছোট আরো পাঁচটি ছেলেমেয়ে আসে, জীবজন্তুর মত নাম। মঙলী, বুধী, কালি, গৌরী (ফরসা ময়লা) মঙ্গলবারে ও বুধবারে জন্মেছে। 'সোমরা' সোমবারে কারো বা জন্ম। ভাল ভাল নাম ঠাকুর দেবতার, বা ভাল করে রাখা নাম, শুধু উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ বৈশ্যের ঘরের শিশুদেরই গরীব হলেও দেখতে পাওয়া যায়। সব নামের সবাই আসে, বলে, বাবুজী, লাল গোলী দেও।

নীতিশ অন্য মনে পকেটে অনেকগুলি লজঞ্জুস নিয়ে বেরুল। নিজের ভাবনা মোড় নিয়েছে, কজোড়লাল, মঙলী, সোমরা নান্‌গাদের (মামার বাড়ীতে জন্মেছে 'নান্‌গা' তাই) দিকে। পথে নেবে গেল।

প্রতুলদের বাড়ী যেতে আর প্রতিদিন ভরসা হয়না, যদি রুথদের কথা জিজ্ঞাসা করে। কি বলবে, বলবার কি আছে। যেন ভাল লাগে না। বলা অবশ্য যায় কিন্তু গায়ে পড়ে কি বলা যায়।

শীতের আমেজ দেখা দিয়েছে। ছেঁড়া জামাপরা বালক-বালিকারা বড় হাতের জামা, কেউবা হাতে বোনা স্থতার মোটা জামা পরে তাকে ঘিরে দাঁড়াল। বাবুজী কারুকে লালগুলি, কারুকে লাল মাছ, কারুকে লেবু একটা করে দিল।

তারপর স্টেশনের দিকে গেল। স্টেশনে গাড়ী যাওয়া-আসা, লোক নামা ওঠা দেখতে অনেক সময় কাটে। বই, খবরের কাগজ সহজে পাওয়া যায়। এক কাপ চা'ও পাওয়া

যায়। কয়েক মুহূর্তের মাঝে অনেকখানি জগতের লোক অনেক স্তরের মানুষ তাদের মান, অপমান, লাঞ্ছনা, খাতির, সবই এক সঙ্গে চোখে পড়ে। খানিকটা রাত্রি হলে নীতিশ ফেরে। ভবঘুরের মত উদ্দেশ্যহীন ভাবে ফিরে আসে। মনের যেন সমতা নেই, শান্তি নেই। অথচ তার কোনো দোষ ছিল না কেন যে জড়িয়ে গেল।

টুলুর কথা মনে পড়ে। সেও,—কিবা দরকার ছিল ওর সঙ্গে বিয়ের কথা তোলার। আচ্ছা, কে তুলল? দিদি কি? না দিদি বোধ হয় নয়, তবে? জানে না। শুধু ভাবে কেন কথাটা উঠল। আর ও চলে এলো। ও যদি না আসত! তাহলে কি হ'ত? কে জানে, কি হ'ত। জ্যেঠা মহাশয় রাগ করলেন তাতে তো ওখানে থাকা যেত না।...আর রুথ? এটা কি আশ্চর্য ঘটনা। কেন এমন মনে হয় লোকের। আচ্ছা, মোহনলালজী কি জানেন এসব কথা? শিউশরণ গেল কেন? ওই তো যেন রুথের ওপর আকৃষ্ট ছিল মনে হত। কিন্তু রুথের দিক থেকে তো কোনো রকম ঘনিষ্ঠতা বা নীতিশের দিক থেকেও সে রকম আগ্রহ দেখা যায় নি। তবে কেন এমন কথাটা গঙ্গাবাঈ বললেন।

ওকে তাহলে এদেশও ছাড়তে হবে। কিন্তু এখন তো নয়, আরও মাস দুয়েক। তাইতো দুঃসহ হয়ে উঠছে। কিন্তু দুর্জয় শীত। বেলা ছোট্টো, স্কুল থেকে ফিরতেই সন্ধ্যা, কাজেই একটা সুবিধা যে কর্তব্যের দেখাশোনা করবার দায়

থাকে না। শীতের সকালও বেলায়, আটটার আগে নয়, সন্ধ্যাও পাঁচটায়।

পৌষের সন্ধ্যায় সহসা একদিন স্টেশনে নাব্‌ল বীণা। বীণা আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে, 'আপনি এখানে? প্রতুলদা এসেছে নাকি? কিন্তু আমি তো খবর দিই নি।'

নীতিশের পরিচয় হয়েছিল, ঘনিষ্ঠতা হয়নি। কিন্তু বেশ ভাল লাগল যেন বাংলা কথা শুনতে, আর বীণার সহজ কথার সুর।

সে বল্‌লে, 'না, প্রতুলতো আসেনি। আমি এমনিই বেড়াতে আসি এখানে। পৌঁছে দোব বাড়ীতে?'

বীণা স্মিতহেসে বল্লে, 'বেশ তো মজা হ'ল। ভালই, চলুন একলা আর যেতে হবে না।'

নীতিশ বল্লে,—'বড়দিনের ছুটি?'

বীণা বল্লে, 'হ্যাঁ, ওদের বেশ ছুটী দেয়, তা দিন পনের। শুধু বসে থেকে কি করব। তার চেয়ে মাসীমাদের কাছে কাটিয়ে যাই। বাংলা কথা না বলে বলে যেন মনে হয় কোথায় রয়েছি। প্রায় নির্বাসন।'

নীতিশ হাসলে, বল্লে, 'অনেকটা তাই বটে।'

টাঙ্গার উপর জিনিষ কটি তুলে ওরা বসে ঘড় ঘড় ছড় ছড় করতে করতে প্রতুলের বাড়ীর দিকে চল্‌ল।

নীতিশ বল্লে, 'ওখানে তো বাঙালী অনেক শুনেছি, আপনাদের আলাপ হয়নি? তাদের মেয়েরা পড়ে না?'

বীণা হাসলে, বল্‌লে, 'আমাদের সঙ্গে আলাপ করে না ওরা, আমরা যে 'টীচার'। সাদা 'টীচারের' সঙ্গে গায়ে পড়েই করে অবশ্য। ওদের বড় লোকদের বড় নাক উঁচু, আর গেরস্থরা ঘোর ভাল মানুষ গেরস্থ। বড়দের মেয়েরা দুটো তিনটে পড়ে আমাদের স্কুলে। 'কন্‌ভেণ্টে' পড়ে 'চাল' দেবে তাই। তাদেরও কম 'নাক' নয়!

নীতিশ হেসে বল্লে, 'আপনারা ওদের তাহলে কি শেখান? যদি ওদের ঐ রকম মেজাজই রইল?'

বীণাও হেসে বল্লে, 'কিছু না। একটার পর একটা ক্লাস প্রোমোশন পাইয়ে দেওয়া ছাড়া আমাদের কি কাজ? আমরা পয়সা নিয়ে পাশ করানো ছাড়া তো আদর্শ প্রচার করতে বসিনি, তাতে আবার বিলিতী স্কুলে। আমরা কিছু শেখাবার আগেই তারা খুব ভাল করে বড়লোক গরীব লোক দিশি স্কুল বিলিতী স্কুলের ভেদ তারতম্য জানে। রাজপুত আছে, শিক্ষিত ব্রাহ্মণ বেলিয়ার ঘরের মেয়েরা আছে, বাঙালীও বল্লুম গোটা তিনচার। সবাই এক। ভাল করে ইংরেজীটা বলতে শিখবে, তারপর ভাল বিয়ে হবে, বাড়ী গাড়ীওয়ালা ঘরে। তাদের আদর্শের কি দরকার? দেশ বা জাত কিম্বা সমাজ বা অন্য স্তরের মেয়েদের কথা? নাঃ। মেম সাহেবদের মত ইংরাজী বলা ছাড়া ওদের জীবনে এখন আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। সেইটাই ওদের সবচেয়ে বড় দরকার। তাহলেই ভাল চাকরী অর্থাৎ ভাল

বিয়ে হতে পারবে। ওদের অভিভাবক একজন সেদিন এই কথাই বলছিলেন।'

গাড়ী বাড়ীর দিকের রাস্তায় মোড় ফিরল।

নীতিশ অন্যমনস্কভাবে একটু হেসে বল্লে, 'তাছাড়া করবারই বা আছে কি বেচারীদের!'

তার নিজেদের পড়ার কথা, বিলাত যাবার, আকাঙ্ক্ষার কথা, বড় চাকরী পাওয়ার মোহের কথা মনে হচ্ছিল। তারা কোন্ কথা, কার কথা, কোন্ আদর্শের কথা, সমাজের কোন দুঃখ দারিদ্র্য দৈন্যের কথা ভেবেছিল। আগে কিছুই ভাবত না, মনেও করত না কোনো 'মঙলী' 'এতোয়ারিয়া' 'বুধী' 'সোমারু' 'কজোড়া'দের কথা, যদি না বাড়ী থেকে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত না পেত। তাইবা ভাবতে জানে কতটুকু? দেখতে পায় মাত্র। হয়ত অবস্থার কোনখানে একটু মিল খুঁজে পায়?

হঠাৎ তার মনে হল—এই যে ওদের কথা ভাবা আর মনে করা যে কত ভাবছি, এও যেন শিক্ষিত মনের একটা বিলাস। তার মনকে যেন কে এক ঘা মেরে গেল। নিজেই নিজের কাছে সঙ্কুচিত হয়ে গেল। ওই শিক্ষাহীন অন্নহীন নিরুপায়দের সঙ্গে কারুরই কোনো মিল নেই। ওদের জন্য কিছু করতে না পারলে ভাবাটাও যেন নির্লজ্জ স্পর্ধা তাদের। যদি মহাত্মা গান্ধীর মত সত্যিকার ভাবতে পারত! তার মুখে আর কোনো কথা এলো না। গাড়ী দাঁড়াল প্রতুলদের বাড়ীর সামনে।

হঠাৎ গাড়ীর শব্দে বিনু মিনু প্রতুল মাসীমা বেরিয়ে এলেন। বীণাকে দেখে আশ্চর্য্য ও পরম   ন্যাতশকে দেখে আরো আশ্চর্য্য হলেন এবং সেই যোগাযোগ সমস্তার ব্যাখ্যা শুনেও খুব খুসী হলেন।

রাত্রে বাড়ী ফিরে নীতিশ টেবিলের ওপর একখানা চিঠি পেলে। বুলুর হাতের লেখা। অনেকদিন পরে। অনেক রকম খবর দিয়েছে। অসুখ-বিসুখ, নলিনের চাকরী পাওয়া, বেলা. ইলা, প্রবীর মনীশের খবর। শেষের দিকে একটা লাইন কাটা। তারপর সেইটেই আবার তলায় লেখা।

লেখা, ম্যালিগ্‌ন্যান্ট ম্যালেরিয়া হয়ে টুলু মারা গেছে এক মাস হল। শ্বশুর বাড়ীতেই ছিল।

মর্মছিন্নভিন্নকরা, অস্তিত্ব আশা জীবন ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা প্রিয়জনের মৃত্যু শোক নয়, অন্তরঙ্গ পরম প্রিয় বন্ধুবিয়োগ নয়. পরম স্নেহাস্পদ স্বজনবিয়োগ নয়; কিন্তু নীতিশের যেন তেমনই অব্যক্ত বেদনা ক্ষোভের সীমা রইল না। কি যেন এক অজানা অপরাধের বোঝা তার মনের ওপর পাথরের মত ভারী হয়ে চেপে বসল।

নীতিশ নিঃস্তব্ধ হয়ে বসে রইল টেবিলের সামনে চৌকিটায়।

১৫

হোলার ছুটীতে নীতিশের যাবার সময় এসে পড়ল।

ছোট ছোট জিনিষপত্র কত-না দরকারী মনে হ'ত, সেগুলো ফেলাছড়া, বাক্স-বিছানা সব গোছগাছ করা সারা হ'ল। পাড়ার শিশু ভোলানাথের দল সব এসে শুষ্ক মুখে, কেউবা সকৌতূহলে ঘরে দাঁড়িয়েছিল। বাবুজী কেন যাবেন? কোথায় যাবেন? কবে ফিরবেন? ফিরবেন যখন কি আনবেন ওদের জন্য? বুধির জন্য আর কজোড়ের জন্য বল আরো দু একজনের জন্য ঐসব জিনিষের ফরমাস হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে ক্যালেণ্ডার, ছবি, ছেঁড়া বই, ভাঙা পেন্‌সিল, খালি দোয়াত, সাবানের বাক্স, বিল্লু-মিন্নুর জন্য আনা রঙিন পাথর, নানাবিধ মূল্যবান সম্পদ তারা সংগ্রহ করতে লাগল।

নীতিশের মনে হতে লাগল সত্যি দেবার মত যদি কিছু থাকত, কিম্বা কিছু কিনে দেয়া যেত। না, দেবার মত তো কিছু নেই-ই। কেনবার মত পয়সাও নেই। অত জনকে দেবেই বা কি করে।

গোছগাছ সারা হ'ল।

প্রতুলের বাড়ীতে গিয়ে দেখল, বীণা এসেছে। ছুটীতে কয়েকদিন দেখা-শোনা হয়ে যেন বেশ ভাল লাগল তাকে। নীতিশের ওকে দেখলে মনে হয় টুলুর কথা। যদিও টুলুর সঙ্গে আকারে বা স্বভাবে সাদৃশ্য কিছুই নেই।

বীণার নির্ভয় মন, সোজা স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি, সাহস, টুলুর সঙ্গে মেলেনা। সে ভীরু অসহায় প্রকৃতির ছিল—তার পারিপার্শ্বিক তাকে সেই অবস্থাতেই রেখেছিল।

নীতিশের মনে হয় টুলুকে যদি এইভাবে মানুষ করা হ'ত।

বীণা জিজ্ঞাসা করলে, 'সত্যি কাল যাচ্ছেন? কোথায় যাচ্ছেন?'

প্রতুল বল্লে, 'যাওয়া ঠিক করে ফেল্লি একেবারে?'

নীতিশ বল্লে, 'হ্যাঁ যাচ্ছি তো কাল। তবে কোথায় যাব ঠিক, এখনও ঠিক করতে পারিনি। মনে হচ্ছে একবার কলকাতায় যাই।'

প্রতুল বল্লে, 'যা না, ভালই তো। সুধীশ তো যেতে লিখল কতবার।'

প্রতুলের মাও এসে দাঁড়িয়েছিলেন, বল্লেন, 'একবার যাও না দেশে, জ্যেঠারাও তো বুড়ো হয়েছেন দেখাশোনা করে এসো। আপনার জন বলতে ওঁরাই তো আছেন।'

নীতিশ চুপ করে রইল। প্রতুল একটু হাসলে।

আপনার জন? সম্পর্ক অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সম্পর্কই তো সব নয়, আশ্রয়ও সব নয়, তা ছাড়াও যে কিছু আছে পৃথিবীতে। কিন্তু সেকথাও আর ভাবতে ইচ্ছে হয়না নীতিশের। যাবার লোভ হয়, কিন্তু কি এক তিক্ত ভয়ে সমস্ত অন্তর কটু হয়ে ওঠে।

প্রতুলের মাকে নীতিশ বল্লে, 'হ্যাঁ যাব। আগে ভাবছি, এদিকে কাজের একটা ঠিক করি, তারপর যাব।' তারপর প্রতুলকে বল্লে, 'কি বলিস্?'

'কাজ কোথাও পেলি?' প্রতুল বল্লে।

'আমেদাবাদে শুদ্ধ খদ্দর ভাণ্ডারে একটা কাজ পেতে পারি।'

'সেকি? খদ্দর ভাণ্ডার? সেকি সুবিধা হবে? কে যোগাড় করে দিলে?' আশ্চর্য্য হয়ে প্রতুল বল্লে।

'আমাদের এখানকার খাদি ভাণ্ডারের বজরং সহায় বলছিলেন। তা মনে হ'ল দেখাই যাক্ না, কিছুই ভাল কাজ তো করছিনা, যদি কোন ভাল কাজের সঙ্গেও থাকি। তা ছাড়া ওখানে শাবরমতী আশ্রমটীও দেখা হবে।'

বীণা বল্লে, 'সত্যি আমারো অনেকদিন থেকে দেখবার ইচ্ছে প্রতুলদা, নীতিশবাবু গেলে চলনা আমরাও দেখে আসি।'

নীতিশ বল্লে, 'বেশ তো খুব ভাল হবে।'

প্রতুল বল্লে, 'তাহলে তোর জীবনের সব ধরণের শিক্ষার কি একেবারে মোড় ফিরে গেল? একেবারে দোকানের সেল্‌স্‌ম্যান হয়ে যাবি?'

নীতিশ হাসলে, বল্লে, 'মাথা নেই তার মাথা ব্যথা। জীবনের ধারা-ধরণ বা কি ছিল, আর শিক্ষাই বা কি পেলাম? খদ্দর ভাণ্ডারে কিন্তু অনেক কিছুই জানা যায়, ওদের সবটাই

বেচা-কেনা নয়। দেশের কথা বেশ ভাবে ওরা। সবাই না ভাবুক, ভাবনার অনেক ধারা আসে,—এসে পড়ে ওদের মাঝে। বজ্‌রং সহায় চম্পারণের লোক কিন্তু দেখছ তো কত দূরে এসে পড়েছেন! বেশ লোক না?'

প্রতুল একটু হেসে বল্লে, 'তা বটে। তা আমরাও তো কত দূরের লোক! খুব মন্দ লোকও নয়!'

তারপর বল্লে, 'এইবারে আভিজাত্যের তর্কের তোদের শেষ লক্ষণ মিলছে যেন। একেবারে ব্রাহ্মণ আর ভিখিরি একসঙ্গে।'

নীতিশও হাসলে, বল্লে, 'তা আর কই হ'ল? জ্ঞানের ব্রাহ্মণ্য এত সোজা নয়! তবে শেষ লক্ষণটা—?'—কথা শেষ করলে না।

প্রতুল বল্লে, 'নাই-বা চাকরী ছাড়তিস্?—না গেলি?'

বীণা উৎসুকভাবে নীতিশের পানে চেয়েছিল।

নীতিশ একটু হাসলে, 'সেকথা আমারও মনে হচ্ছে।'

প্রতুল বল্লে, 'তবে থেকেই যা, অন্য চাকরী কর্ না হয় এখানেই। বোস্, আমি কাপড়-চোপড় বদলে আসি।'

বসন্তের সন্ধ্যা। কিন্তু তখনো শীত আছে। যেন ঘোর-ঘোর অন্ধকার ঘর, আলো জ্বলেনি।

বীণা সহসা বল্লে, 'থেকেই যান না নীতিশ বাবু।'

নীতিশ চকিত হয়ে বীণার দিকে চাইল।

বীণা বল্লে, 'এখানে ছুটীতে এসে বেশ লাগত তবু—একটা দল যেন।'

নীতিশ বল্লে, 'হ্যাঁ কিন্তু আর তো থাকা যায় না, সব যে ঠিক করে ফেলেছি।'

'ঠিক মানে?—চাকরী ছেড়েছেন, এই?' বীণা হাসলে।

নীতিশও হাসলে। বীণার মনে হল, যেন কি ভাবনা, কি কথা একটা নীতিশের মনে রয়েছে যা ওরা কেউই জানে না।

বীণা বল্লে, 'আপনি কি কলকাতায় যাবেন এখন?'

নীতিশ বল্লে, 'তাও তো জানিনা। না-ই বোধ হয়। কেননা থাকার জায়গা আর একটি কাজের আগে ঠিক হোক।'

হঠাৎ বীণা বল্লে, 'নতুন জায়গায় খুব একলা পড়বেন কিন্তু ঠিক আমার মতই।'

নীতীশ একটু চুপ করে রইল, তারপর বল্লে, 'হ্যাঁ, কিন্তু মানুষকে বন্ধুর মত সত্য করে বন্ধুভাবে তো পাওয়া প্রায় যায়ই না। আমরা মনে মনে তো বেশীর ভাগ লোকই একলা।' তারপর একটু হাসলে, 'শুধু জানিনা সেকথা—নয় কি?'

বীণাও হাসলে, বল্লে, 'ঠিক বলেছেন। কিন্তু মানুষ তো কথা কইবারও সঙ্গী চায়, সেও এক রকম বন্ধুত্ব।'

চাকর আলো দিয়ে গেল, মিটমিটে ছোট টেব্‌ল-ল্যাম্প।

নীতিশ অন্যমনস্কভাবে আলোর দিকে চেয়ে রইল। তারপর বল্‌লে, 'তা সত্যি আমরা তো সন্ন্যাসী বা যোগীর মত একলা থাকতে জানিনা। কিন্তু জানেন, ভালো সঙ্গ অর্থাৎ

নিজের মত সঙ্গী না পাওয়ার চেয়ে একলা থাকা ভালো। অবাঞ্ছিত সঙ্গ বড় আড়ষ্ট লাগে, না ?'

বীণা একটু হেসে বল্লে, 'দেখবেন আমাদেরও যেন ও দলে ফেলবেন না !'

নীতিশের মুখ কৌতুকের সহজ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, বল্লে, 'সত্যই তো, কি বলা যায়—হয়ত আপনাদেরও ওই দলে ফেলব !'

এরকম সহজ স্বচ্ছ হাসি নীতিশের মুখে বীণা দেখেনি। তার হঠাৎ মনে পড়ল, নীতিশের শিক্ষা, পারিপার্শ্বিক, বাড়ীর ও বংশের কথা, বাংলা দেশের একটা শিক্ষিত স্তরের কল্পনার ধারা ও রুচির কথা। অবশ্য সুমিত্রার বর মনীশের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে। সে নীতিশের মত নয়, যেন একটু অহঙ্কৃত স্থূল প্রকৃতির স্বকেন্দ্রিক ধরণের। যেমন বড় লোকের বাড়ীর কৃতী ছেলেরা হয়ে থাকে। আত্মকথা ছাড়া, আপনার কৃতিত্ব প্রচার ছাড়া তাদের আর বক্তব্য থাকে না, ক্রমাগত ঘুরে-ফিরে তারা নিজেদের কথাই বলে।

বীণার বেশ ভালো লাগেনি তাকে। কিন্তু তাতে কি ? বড় লোকের ছেলে, বড় লোকের জামাই, আবার বড় কাজ করে—বিলাত-ফেরৎও ! তার ভালো না লাগলেই বা কি। খ্যাতির সীমা মনীষের নেই। বীণার মনে হয় সকলের মনীশকে প্রশংসাতে, সেই সরল গ্রাম্য লোকদের কথা, যারা ধন ঐশ্বর্য্য শক্তি গর্ব অহঙ্কার দেখলে সভয় মুগ্ধতায় চেয়ে

থাকে। অতখানি ওঠবার আশাও নেই তাদের, লোভও নেই, কিন্তু মোহিত হয়ে থাকে গল্পে-শোনা অজগরের নিঃশ্বাসের সমুখে মুগ্ধ জীবের মত।

বীণাও হাসল, বল্লে, 'তা ফেলবেন, কি আর করা যাবে। তবু যতক্ষণ সঙ্গী না পাবেন আসতে তো হবে। অবশ্য যোগী না হওয়া অবধি।'

নীতিশ বল্লে, 'আপনি 'কাদম্বরী' পড়েছেন?'

বীণা বল্লে, 'পড়েছি, সংস্কৃত নয় অনুবাদ। চমৎকার, না?'

নীতিশ বল্লে, 'হ্যাঁ। যেন ছবির মত সব দেখতে পাচ্ছি মনে হয়, এমনই চমৎকার বর্ণনা। কিন্তু আমি বলছি, চন্দ্রাপীড়ের পত্রলেখার কথা। কাদম্বরী আর মহাশ্বেতা সুন্দরী হতে পারেন, নায়িকাও বটে, কবি তাদের জন্য অনেক পাতা আর পরিশ্রম খরচ করেছেন কিন্তু চণ্ডালকন্যা আর পত্রলেখা আমাদের মনহরণ করে অনেক বেশী যেন।'

বীণা অবাক হয়ে শুনছিল। নীতিশের স্বভাবের এদিকটা সে দেখেনি, বল্লে, 'আপনি তো বেশ সমালোচক দেখছি!'

নীতিশ হাসল, বল্লে, 'কি ভাবেন, একেবারে অজমুখ্যু? আমি বলছিলাম শুধু মনোহারিতাও নয়। পত্রলেখার সঙ্গে চন্দ্রাপীড়ের বন্ধুত্বের কথা। কম বয়সের মেয়ে আর পুরুষে এমনধারা বন্ধুত্বের ওরকম অদ্ভুত সহজ চিত্র দেখেছি বলে মনে হয় না। বিদেশীও নয়, আধুনিকও নয়—কত যুগ আগের লেখা! যেন একটুও কষ্টকল্পনা নেই। অন্য লোক

হলে এমন কি এখনকার কেউ হ'লে ওতে একটা অদ্ভুত মনস্তত্ব নরনারীত্ব এনে দিতেন।'

বীণা বল্লে, 'আরও এক জায়গায় ওরকম বন্ধুত্ব আছে, মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ আর দৌপদীতে। প্রকাণ্ড বই আর অনেক রকমের চরিত্র আছে বলে হঠাৎ চোখে পড়ে না। তা ছাড়া কাদম্বরীতে পত্রলেখা যেন ছবিতে তুলির টানের মত বা কাব্যের উপমার লাইনের মত, মহাভারতের সবটাই ঘটনা ও কাহিনীতে ঢালাই করা।'

নীতিশও শুনছিল। হঠাৎ বীণা বল্লে, 'আচ্ছা, রুথদের পরিবারটা আপনার কেমন লাগে?'

কথার মোড় হঠাৎ এদিকে ফিরল, নীতিশ অবাক হয়ে গেল। কিন্তু বল্লে, 'বেশ, কিন্তু বড় জটীল।'

প্রতুলের স্নান সারা হ'ল, এসে দাঁড়ালো,—'কে জটীল? কার কথা হচ্ছে?'

নীতিশ বল্লে, 'কাবেরীবাঈদের বাড়ীর ব্যাপার—খুব জটীল নয়?'

'তা বটে। কিন্তু ছেলেমেয়ে অর্থাৎ মোহনলালজী আর কাবেরীবাঈকে কিন্তু বেশ ভালই লাগে?

বীণাও বল্লে. 'আমি বেশী দেখিনি কিন্তু বেশ ভালো লেগেছিল।'

প্রতুল বল্লে, 'ওরা চারজন চার রকমের স্বভাব। তা ছাড়া যেন ছুটো নতুন ও পুরানো সংস্কার আর সভ্যতা মিলতে

এসে অদ্ভুতভাবে থমকে দাঁড়িয়েছে, মিশ খেতে পারেনি। পাশাপাশি চলেছে কিন্তু। এলাহাবাদের গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমের মত ;—দেখেছিস সঙ্গম ?'

বীণা বল্লে, 'তুমি আবার সঙ্গম দেখলে কবে ?'

'ঐ যে সে বছর মাকে কুম্ভতে নিয়ে গিয়েছিলাম। তীর্থ-টার্থ করেছি, কিছু পুণ্যি হয়েছে। কি ভাবিস আমাকে। একটু চা করতে বলে আসি। তোরা খাবি ?' উত্তরের অপেক্ষা না করেই প্রতুল চলে গেল।

নীতিশ বল্লে, 'ঠিক সত্যিই যেন সঙ্গমের স্রোতের মত। কিন্তু আপনি হঠাৎ রুথদের কথা জিজ্ঞাসা করলেন যে।'

'আমার ওদের বেশ ভলো লেগেছিল। অনেক সময় কথা না বল্‌লেও মানুষকে যেন বেশ বোঝা যায় না। রুথকে আমার তাই মনে হয়েছিল !'

নীতিশ চুপ করে রইল।

বীণা বল্লে, 'বন্ধুত্বের কথা বেশ বলেছেন আপনি। আবার জানেন, যেমন বলে লোকেরা, একজনকে দেখলেই হাঁড়ির একটা ভাতের মত সবগুলোর সম্বন্ধেই বলা যায়। তাই তারা বলে, মেয়েতে মেয়েতে বন্ধুত্ব হয়না, মেয়েতে পুরুষেও শুধু বন্ধুভাব হয়না। মেয়ে মেয়ের পক্ষে হয়না—তারা সঙ্কীর্ণ-মনা, আর মেয়ে পুরুষে তো চিরকালের আদিম মনোভাব। যেন মানুষ আদিমতাকে মেনেই চলছে সর্বত্র।'

নীতিশ বল্লে, 'হ্যাঁ, কিছুটা মানুষের চিরকালের সত্যি,

বাকি অনেকটাই তো নিজেদের সুবিধার জন্য তৈরী ভিতের ওপর গড়া। মানুষ নিজে এখন যা, তা যে কতটা তৈরী করা, সেতো জানা কথা। কাজেই অনেক জিনিষের মত, অনেক মতামত, রুচির মত, তৈরী জিনিষ বদলায়, ভাঙে, গড়ে ওঠে। মানুষের মধ্যে সত্যি মানুষ কতটুকু আর গড়া মানুষ কতখানি সেটা ভাবলে নতুন করেই অনেক জিনিষ নেওয়া যায়। অনেক নিয়মের রদ-বদল হয়। মানুষের মধ্যে তৈরী সংস্কারই তো চোদ্দ আনা বলা যায়। সে প্রকৃতির জীব,—বাকিটুকু দু আনার।

প্রতুল এসে দাঁড়িয়েছিল। বল্লে, 'তোমরা তো খুব জমিয়ে গল্প করছ! আলোচনাটা কি নিয়ে?'

নীতিশ বল্‌লে, 'কিছুই এমন নয়, বন্ধুত্ব নিয়ে।'

'বন্ধুত্ব নিয়ে?'

বীণা বল্‌লে, 'হ্যাঁ মেয়েতে মেয়েতে, মেয়ে পুরুষে। অর্থাৎ তোমাদের মতে আমার সঙ্গে রুথের বন্ধুত্ব হ'তে পারা শক্ত এবং সকল জনসাধারণের মতে—'বীণা হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে গেল, মনে হল এবারে কার সঙ্গে কার বন্ধুত্ব বলবে।

নীতিশ আর প্রতুল দুজনেই বীণার দিকে চেয়েছিল, নীতিশ মৃদু হেসে বল্লে, বড় মুস্কিলে পড়লেন দেখছি।'

এতক্ষণে প্রতুলও সবটা বুঝলে,—'বুঝেছি, তোর সঙ্গে নিতুর বন্ধুত্ব অর্থাৎ যে কোনো মেয়ের সঙ্গে, এই যেমন রুথের সঙ্গেও আমার বন্ধুত্ব,—একেবারে চলবে না, তার লোকে অন্য নাম দেবে।'

নীতিশ হাসলে, প্রতুলও হাসছিল, বীণাও অপ্রস্তুতভাবে হেসে ফেল্‌লে। কিন্তু এরপর আর আলোচনা এগোল না।

নীতিশ বল্‌লে, 'আমি আজ উঠি, রাত্তির হচ্ছে কাল স্টেশনে আবার দেখা হবে। কিন্তু আপনার সঙ্গে বোধহয় হবে না ?'

বীণা বল্‌লে, 'কেন, আমরা সকলে বিনু মিনু প্রতুলদা সবাই যাব।'

নীতিশ চলে গেল।

অনেক রাত্রে প্রতুলের মা হঠাৎ প্রতুলকে বল্লেন, 'নিতু সত্যি যাচ্ছে ? হ্যাঁরে—বীণার সঙ্গে ওর বিয়ে হয়না ?'

প্রতুল বল্‌লে, 'না মা, এই বিয়ের সম্বন্ধর ঠেলাতেই ও বেচারা দেশ ছেড়েছে। এখানে যে কি হল জানিনা, কি যেন একটা হয়েছে বুঝতে পারছি না। ওকে আর স্থান ত্যাগ করাতে আমার ইচ্ছে নেই,—আমাদের সম্পর্ক থেকে। নাই-বা হ'ল মা আমাদের মত লোকের বিয়ে, দেখাই যাক্ ফিরে আসে কি থেকেই যায়।'

বীণা এসে পড়েছিল।

প্রতুল বল্লে, 'সেদিন শুনলাম টুলু মারা গেছে, নীতিশই বল্‌লে।'

মা বল্‌লেন, 'কে, সেই বড় বোনের ননদটি ? আহা! বুঝি ভাল বিয়ে হয়নি ? নিতুর সঙ্গে না কথা হয়েছিল বিয়ের ? হ'ল না কেন ? ফর্শা নয় বলে ?'

বীণা অবাক হয়ে শুনছিল, বল্‌লে, 'মারা গেছে?' আমি তো তাকে দেখেছি, সুমিত্রার বিয়ের সময়, বেশ মেয়ে কিন্তু।'

প্রতুল বল্লে, 'বিয়ে হয়েছিল ভালই বোধ হয়। নিতু করেনি, কাজকর্ম করছিল না তো।'

প্রতুলের মা শুতে চলে গেলেন। বীণাও গেল।

অনেক রাত্রি অবধি ঘুম আসেনা বীণার। টুলু মারা গেছে। টুলুর সঙ্গে বিয়ের কথা হয়েছিল? নাতিশ কি টুলুকে ভালবাসত? আর রুথ? কিন্তু ওরা তো ক্রিশ্চান। বীণার মন হাসে। কিন্তু ভালবাসা কি জাত মেনে হয়? কিন্তু পত্রলেখার কথা উঠ্‌ল কেন? চিরকালের ইতিহাসে কোনদিন আর কোনো মেয়ে পুরুষের মধ্যে কি অত সহজ শ্রদ্ধাময় সদ্ভাব হয়নি? কিন্তু ওতো অত্যন্ত সংক্ষেপ ছবি। আজ কিন্তু কে সে পত্রলেখা? রুথ? টুলু কি? সুমিত্রা কি? কে? আর কোনো নাম বীণার মনে পড়ে না। সন্তর্পণে আকাঙ্ক্ষিত একটি নাম, মনে জাগে, যদি সেই নামটি হ'ত। না, বীণা খুব দৃঢ়, বুদ্ধিমতী। ভাবপ্রবণ বা নেকা মেয়ে নয়। তার মনের আশার বিলাস অত নেই, তবু মনে হয়। অবশেষে বীণা ঘুমিয়ে পড়ল।

১৬

ছুটিতে রুথ বাড়ী আসেনি। বিমনা যমুনাবাঈ সেকথা কারুকে বলতে পারেন না যদি গঙ্গাবাঈ বুঝতে পারেন ঘুণাক্ষরে, বড়ই অপ্রস্তুত হতে হবে। মোহনলালকেও আর কিছু বলেন না। মোহনলাল মাসীর ব্যাকুলতা বুঝতে পারেন, কিন্তু তিনিও সহজভাবেই কিছু বলেন না। যেন রুথ সত্যই পড়ার জন্য আসেনি।

এমন সময়ে পরীক্ষার ফল বেরুল। খবর এলো মা মাসীদের কাছে পাশ করেছে রুথ বেশ ভাল করে, তার শ্রম সার্থক হয়েছে।

কিন্তু এখন আসতে পারবে না, ব্যস্ত আছে।

যমুনাবাঈ সভয়ে ব্যাকুলভাবে ভাবেন অনেক কথা।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই রুথ এসে পড়ল হঠাৎ।

যমুনাবাঈ গঙ্গাবাঈ খুব খুসী হলেন। রুথ তাঁদের বললে, সে নসিরাবাদেই হাসপাতালে চাকরী পেয়েছে। বাড়ী পাবে থাকবার। জননীরা উৎসুক হয়ে আরো কি বলে শুনতে চা'ন, সে কিন্তু আর কিছুই বলে না, অন্য মনে থাকে যেন।

সন্ধ্যার পর মোহনলালের সঙ্গে গল্প করতে বসে। বলে "ভাইজী, একটু বেড়াতে যাবে?'

মোহনলাল বুঝতে পারেন, তার যেন কি কথা রয়েছে।

শ্রাবণের পাহাড় শ্যাম হয়ে উঠেছে, ধূসর বালি ভিজে নরম হয়েছে ; পায়ের জুতোর দাগ স্পষ্ট হয়ে পড়ে, আর ঝরে ঝরে যায় না। মাঠের ও ভুট্টাক্ষেতের পাশে পাশে ভাই-বোনে চলে। দুজনেই চুপচাপ, নয়ত এমনি কথা কয়। সহসা রুথ বল্লে, 'শিউশরণজী একটা চিঠি লিখেছেন।'

মোহনলাল জিজ্ঞাসুভাবে চেয়ে রইলেন ওর দিকে।

লিখেছেন ঃ তোমার পরামর্শ নাকি নিয়েছেন যাবার সময়। আমায় কিছু তো তুমি বলনি? মাকেও নাকি লিখবেন। রুথ চুপ করলে।

মোহনলাল বল্লেন, 'তোমার সঙ্গে তো আর আমার দেখা হয়নি, তুমি যে আগেই চলে গিয়েছিলে। আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আমি বলেছিলাম লিখতে পার।'

'হ্যাঁ, লিখেছেন তাই। কি করি বলত? মার আর মাসীজীর মেজাজ জান তো?'

রুথ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

তারপর বল্লে, 'আমার বিয়ে করতেই ইচ্ছে নেই। তা ছাড়া শিউশরণজী'—রুথ চুপ করলে।

মোহনলালও চুপ করে চেয়ে রইলেন। শেষে বল্লেন, 'কি? শিউশরণ বলে থামলে যে?'

'শিউশরণজীকে এমনি ভাল লাগতে পারে, বিয়ের কথা আমি ভাবিনি।'

'কিন্তু জানো তো ও সেইভাবেই আসা-যাওয়া করত।

ওর মনের ভাবটা নিশ্চয় তুই বুঝতে পারতিস্। মায়েরা তো অনেকদিন ধরেই বুঝতে পারছিলেন।

'সে বুঝবো না কেন। কিন্তু ভাল লাগা বা মানুষটাকে সহ্য করে নেওয়া আর বিয়ে করা বা ভালবাসা—অনেক তফাৎ, নয় কি?'

'তাহলে তুই এতদিন মিশতে দিলি কেন? ওতো ভাবছিল তোরও বেশ ইচ্ছে আছে।'

রুথ হেসে ফেল্লে, 'ঐতো! ঐ জন্যেই ওকে বিয়ের কথা ভাবতেও পারব না। বাড়ীতে সকলেই আসে, ভদ্রভাবে কথাবার্ত্তা কই, গল্প করি, তাই বলে সে ভেবে বসবে আমি ভালবেসে ফেলেছি এতো বড় মুস্কিলের কথা। না ভাইজী; উনি বড়ই সাদাসিদে লোক। উনি ভাবেন যে ভালবাসা অভ্যেস করা যায়। উনি পছন্দ করলেই আমিও পছন্দ করব! বড়ই সেকেলে গল্পের মতন লোক উনি।'

মোহনলালও হাসলেন, 'তা' তোর এই মনোভাবের আভাস আরও আগে ওকে দিসনি কেন? এখন কি করবি? তা ছাড়া ওতো চাকরী ভাল পেয়েছে, লোকও ভালো। এক শুধু ওর জাত নিয়ে যা মা-দের অপছন্দ।'

রুথ একটু হেসে বল্লে, 'চাকরী তো আরো অনেক লোকই ভাল পায়—তাই তারা বিয়ের কথা তুললেই তো লোকে তাকে বিয়ে করে না। আর জাত—সে মা-দের মতামত আমরা মেনে নোব কিনা—, আমরা তো ক্রিশ্চান মারা তা বুঝবেন।'

মোহনলাল বল্লেন, 'না, মায়েরা তা' বুঝবেন না। তাঁদের মনে আশা আমরা সমাজ না মানি জাত মেনে বিয়ে করব। তাঁদের মনে কষ্ট দোব না। অন্তত আমার মনে হয় তাই ভাবেন ওরা।'

রুথ অসহিষ্ণুভাবে হাসলে একটু, তারপর বল্লে 'মা-দের মত মেনে কি করব না করব তাতো এখনো জানি না। কিন্তু শিউশরণজী—কি লিখি বলত? লিখে দিতে পারি এখন মত নেই, কিন্তু উনি আবার যে ধরণের মানুষ আবার দু'বছর বাদে চিঠি লিখবেন, দেখা করবেন। ওসব মানুষ কেমন জানো, ওদের ধৈর্য্যের শেষ নেই। কাজে লাগা, উপকারে লাগার জন্য অধ্যবসায়ের অন্ত নেই। আবার এত সরল যে চট করে মনে কষ্ট দেওয়াও যায়না।'

রুথ হাসলে, বল্লে, 'কিন্তু অধ্যবসায়ের ধৈর্য্যের দামটা কিছু বেশী দেওয়া হয় না, বিয়ে করতে গেলে? দয়া করে দান করা যায়, বিয়ে করা যায়না।'

মোহনলাল হাসছিলেন, বল্লেন, 'হ্যাঁ সময়-অসময়ে কাজে লাগে বলে দয়া করে বিয়ে করাটা কিছু অতিরিক্তই হয়। তোর সেই পুরাণের গল্প মনে আছে— দধিচী মুনির?'

মৃদু হেসে রুথ বল্লে,—'হ্যাঁ, তিনি মরে হাড় দিয়েছিলেন দেবতাদের উপকারের জন্য। বেঁচে অনিচ্ছায় বিয়ে করতে হয়নি কারুকে তাঁর। মনে হচ্ছে, মরে অস্থি দেওয়াটা বেশী সহজ।'

দুজনেই হেসে ফেল্লে।

মোহনলাল বল্লেন, 'আপাতত তো তাই মনে হয়, এখন চল্ বাড়ী ফিরি।'

রুথ জিজ্ঞাসা করলে, 'আচ্ছা বাবুজী কোথায়? তোমাদের স্কুলের?'

মোহনলাল বল্লেন, 'তিনি মার্চ মাসে চলে গেছেন আমেদাবাদে কাজ নিয়ে।'

রুথ বল্লে, 'কাজ ছেড়ে দিলেন কেন?'

'তাতো জানিনা, ছেড়ে দিলেন হঠাৎ।'

কিছুক্ষণ থেমে রুথ বল্লে, 'বেশ লোক ছিলেন, না?'

মোহনলাল বল্লেন, 'হ্যাঁ, '—তোর তাঁকে ভাল লেগেছিল, না?'

রুথ সহজভাবে বল্লে, 'হ্যাঁ কথা কইতেন বেশ সুন্দর।—কেমন যেন তফাৎ রেখে চলতে জানতেন। বেশ লোক ছিলেন। তুমি কি জানো, মাসীজী তাঁর কাছে আমার কথা বলেছিলেন, বিয়ের কথা আর কি! কি লজ্জা বলত!'

মোহললাল বল্লেন, 'হ্যাঁ শুনেছিলাম।'

রুথ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লে, 'তারপর আর আমাদের বাড়ী আসেন নি বোধ হয়? সেইজন্যই চলে গেলেন বলে মনে হয় তোমার?'

মোহনলাল বল্লেন, 'না আসেন নি আর। তবে গেলেন কেন তা ঠিক বলতে পারিনা।'

রুথ বল্লে, 'কি ভাবলেন আমাদের কে জানে। ভাঁবলেন বোধ হয় আমারই আগ্রহ আছে।'

মোহনলাল হেসে বল্লেন, 'না, তা ভাবেন নি। মা মাসীরা ঐ রকমই কথাবার্তা কন সব দেশেই। মা ভাবছিলেন ভাল লোক, হিন্দু ব্রাহ্মণ, যদি শুদ্ধি করে জাতে উঠে যাস্ তুই বিয়ে হয়ে। বিয়ে হলে ভাল লাগত তোর ওঁকে এতো নিশ্চয়।'

রুথ লাল হয়ে উঠল। একটু হেসে বল্লে, 'এ যুগে মেয়েদেরও মনের ভাব বদলেছে ভাইজী। আমি যাকে ভালবাসিনা তাকে বিয়ে করাও আমার যেমন মুস্কিল, আমাকে ভালোবাসেনা যে, তার সঙ্গে বিয়ে হওয়াও তেমনি অবাঞ্ছনীয়। কোনরকমে বিয়ে হওয়াটাইতো সব নয়।

বাড়ী এসে পড়ল। ভাই বোন বাড়ী ঢুকল।

রুথ যমুনাবাঈকে বল্লে শিউশরণের কথা। মোহনলালও ছিলেন। যমুনাবাঈ সঙ্কুচিত ভাবে চুপ করে রইলেন।

রুথ জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমাদের কি মত ?'

যমুনাবাঈ বল্লেন, 'আমরা কি বলব ? তোর কি ইচ্ছে ?'

নিষ্ঠুরভাবে রুথ জিজ্ঞাসা করলে, 'আমি যদি মত দিই !' যমুনাবাঈ আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন রুথের কথার ধরণে। চুপ করে রইলেন, কিছু বলতে পারলেন না। নীতিশের কাছে বিয়ের প্রস্তাবের অপরাধ আজো সে ক্ষমা করেনি।

মোহনলালও অবাক্ হয়ে গিয়েছিলেন। ভীরু শান্ত প্রকৃতি মাসীর মুখের দিকে চেয়ে তাঁর অস্বস্তি হচ্ছিল।

যমুনাবাঈ আস্তে আস্তে বল্লেন, 'বেশ'। অন্য ঘরে চলে গেলেন।

মোহনলাল বল্লেন বোনকে, 'কেন ওকথা বল্লি? শুধু শুধু মাসীজী দুঃখিত হলেন। সত্যি তো তুই বিয়ে করবি না ওকে।'

রুথ বল্লে, 'তা করবনা। কিন্তু অন্য আরো জাত আছে, তাদের মধ্যে কারুকে তো কখন করতে পারি? সে সময়ে যে সবারির মত নোব তাতো নয়।'

'না, তাতো নয়।' মোহনলালেরও আর বলবার কিছু ছিলনা।

মস্ত একটা চিড় খেয়ে গেল পারিবারিক মনে। কোনো দরকার ছিলনা এত কথার। শিউশরণকে কেন্দ্র করে কথাটা উঠল, তারও কোনো লাভ হলনা। কিন্তু চারটি মানুষের মন যেন চার ভাগ হয়ে গেল।

গঙ্গাবাঈ কিছুই জানতে পারলেন না, বুঝতে পারলেন না কিন্তু দুজনেই সহসা ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে সরে গেলেন যেন।

মোহনলালের মনে হল, সত্যই এযুগে তাঁরা সকলে যেন সহসা স্বাধীন হয়ে গেছেন। নিজের জীবন তাঁদের নিজের, জীবিকাও তাঁদের নিজেদেরই জন্য অতীতের কোনো দায় নেই, দায়িত্ব দাবী নেই। কিন্তু সত্যই কি নেই?

যুগের আদর্শ, দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনের ধরণ সব একেবারে বদলেছে। রামায়ণ মহাভারত, রামচন্দ্রের আদর্শ, ভরতের আদর্শ বদলেছে। সীতারও আদর্শ কি বদলাচ্ছে? এখন যেন্ মানুষ তার স্বল্পপরিসর জীবনের সমস্তটাই নিজের জন্য রাখবে, নিজের কথা ভাববে, নিজের সঙ্গে একান্তভাবে সংশ্লিষ্ট পরিবার স্ত্রী পুত্রের কথা ভাববে। অতীতের কথা তারা ভাববেনা আর। ওঁরা না হয় খৃস্টান কিন্তু আর সকলেও কি বদলাচ্ছেনা ?

কিন্তু মা বাপ কি সত্যই অতীত ?

যুক্তির দিক দিয়ে রুথের কথা সত্য মনে হয়। তিনি নিজেও গঙ্গাবাঈয়ের সব কথা মেনে চলবেন না, চলেন না, জানেন—তবু যেন কি একটা সূক্ষ্ম অতি অস্পষ্ট অস্বস্তিকর বেদনা নিভৃত মনে বাসা বেঁধে থাকে।

রুথ চাকরীর জায়গায় চলে গেল। মাকে বল্লে, 'তুমি কি সেখানে যাবে ?'

যমুনাবাঈ বল্লেন, 'গঙ্গাবাঈ একলা থাকবেন ? বয়স হচ্ছে, পরে কোনো সময় গেলেই হবে।'

জননীর মনে আবার নীড় রচনার বহুদিনের সঙ্গোপন আশা আর ছিলনা। সমস্ত মোহ আকাঙ্ক্ষা সব একেবারে কোন রূঢ় উপেক্ষায় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল যেন। স্বাধীনতা-দৃপ্ত আধুনিক সন্তানের কাছে ক্ষুদ্র আবেষ্টনবাসিনী ভীরু নির্ভরশীল অতীত আদর্শচারিণীদের আর স্থান নেই, সেকথা

জননীরা স্পষ্টভাবে বোঝেননি, কিন্তু সহসা বুঝলেন যেন আজ তাঁরা বাড়তি, অনাবশ্যক অতিরিক্তদের দলে পড়ে গেছেন। ওদের সঙ্গে কোনো মিল নেই, যোগ নেই, ওঁরা শেষ হয়ে গেছেন। শুধু একটা করুণার ওপর ওরা তাঁদের রেখেছে মাত্র।

১৭

কয়েক মাস কেটে গেল আমেদাবাদে। কাজ করা যায়, কাজ আছেও, কিন্তু কাজকে অতিক্রম করেও যা আছে সেটার আর গুঞ্জন থামে না মনে মনে। অবশেষে একখানা তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনে বি. বি. সি. আইয়ের গাড়ীতে উঠে বসল নীতিশ।

ছোটবেলার মোহ, জন্মভূমির, শৈশবকালের সঙ্গীদের মোহ যেন সব মোহের চেয়ে গভীরভাবে মনে ছাপ দেয়। মা নেই নীতিশের কিন্তু 'মা বলিতে প্রাণ করে আন্‌চান্' সে কোন্ জননী—মমতাময়ী মোহময়ী যার কথা সে জানেনা কিন্তু যেন সে মোহের শেষ নেই।

রেলগাড়ী বাংলাদেশের দিকে আসে, তার মনে হয় রবীন্দ্রনাথের সুরদাসের :

"আকাশ আমারে আকুলিয়া ধরে, ফুল মোরে ঘিরে বসে,
কেমনে না জানি জ্যোৎস্না প্রবাহ সর্বশরীরে পশে।
ভুবন হইতে বাহিরিয়া আসে ভুবনমোহিনী মায়া।"

যেন এমন ভুবনমোহিনী মায়া আর কোথাও নেই। ফিরে ফিরে মনে হয়, 'মা বলিতে প্রাণ করে আনচান চোখে আসে জল ভরে'।

তবু যেন কি এক সঙ্কোচ হয়। দেশ, মাটী, স্মৃতির মোহকে ছাপিয়ে যায় সেই সঙ্কোচ আর ভয়। মনে হয় যেন আসাটা ঠিক হল না, ভুল হল? তা' থাকতে তো আসেনি। তবু ধনীর কাছে দরিদ্রের, প্রবলের কাছে দুর্বলের মত সে অস্বস্তিকর সঙ্কোচ রয়েই যায়। ঘোড়ার গাড়ী ছড় ছড় ঝড় ঝড় করে বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়াল। গেটের সামনে দুখানা মোটর তখন ধোওয়া হচ্ছে। বাইরের দিকে বাড়ীর কেউ ছিলেন না। বাড়ীর সামনের দৃশ্য একটু অদল-বদল করা হয়েছে। যেন আরো আড়ষ্ট অনমনীয় মনে হ'ল তার। ভিতরে যাবার পথটা তেমনি অন্ধকার ধরণেরই আছে। সেইটেই যেন ভরসা আনে মনে।

ঘোড়ার গাড়ী দাঁড়াতে দেখে যারা মোটর ধুচ্ছিল তারা একবার চেয়ে দেখ্‌ল শুধু। তারা ওকে চেনে না।

নীতিশ ভিতরে ঢুক্‌ল। যদি সুধীশকে দেখতে পায় আগে। না, কেউ নেই। হঠাৎ সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো বেলা, মেজজ্যেঠার মেয়ে। তার সঙ্গে মেজ জ্যেঠিমা।

'ওমা, নিতুদা কোত্থেকে?' বেলা বলে উঠল। তারপর প্রণাম করলে।

একে একে নানাদিক থেকে, কেউবা সিঁড়ি থেকে, কেউবা রান্নাঘরের দিক থেকে, কেউবা কোনো ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

'ভাইতো, তুই কখন এলি?' 'কতক্ষণ' 'ওমা নিতু যে!'

'খবর দিস্‌নি যে?' ইত্যাদি নানারকম মন্তব্য শোনা গেল।

যথাযোগ্য জবাব দেওয়া হল, কিন্তু সুধীশকে দেখা গেল না কোথাও।

বেলার ছেলেকে কোলে নিয়ে নীতিশ জিজ্ঞাসা করে 'খোকা তোমার বাবা কদিনের ছুটি দিয়েছে?'

অন্য একটি ছোট ছেলে পাশ থেকে গম্ভীরভাবে বল্লে, 'ওর বাবা নেই।' নীতিশ সচকিতে তার দিকে চাইলে।

বেলা চা নিয়ে এলো।

নীতিশ তার হাত থেকে চা নিলে। পরিধানে শাড়ী, হাতে চুড়ি, গলায় হার পরা সহজ বেলার দিকে সে ভাল করে, চাইতে পারল না। মনে হল বোধ হয় ভুল কিছু শুনেছে, বেলা ঠিকই আছে। ভুলই হবে!

যেন কোন জ্যেঠামশাইয়ের গলার সাড়া পাওয়া গেল। ত্রস্ত হয়ে নীতিশ প্রণাম করতে এগিয়ে গেল।

আভিজাত্যের উচ্চাসন থেকে চিরদিনের মত নির্লিপ্ত ভাবে তিনি একবার তার দিকে তাকালেন, তারপর বল্লেন, 'এখনি এলে? কেমন, ভাল ত?' ওরে আমার চা পাঠিয়ে দিয়েছিস?' বলে নিজের বসবার ঘরে খবরের কাগজ খুলে বসলেন। আর দেখতে পেলেন না নীতিশকে।

তারপর অন্য সব গুরুজনদের সঙ্গেও দেখা হ'ল।

নীতিশের মনে হ'ল, যেন মোটে কাল সে কোথাও

গিয়েছিল। সে ছিল না বা ছিল, সেকথা কারুর যেন মনেই নেই। অভ্যর্থনা, সমাদর, স্নেহ, সাদর আহ্বান সে আশা করেই নি বোধহয়, তবু যেন কোন্‌খানে বাজে মনে, হয়ত করেছিল প্রত্যাশা একটুখানি কিছু। সেটা কি? নিজেরও তার জানা নেই কি তা!

ঘরে ঘরে কাজকর্ম রান্নার যোগাড়ে নিযুক্ত হলেন গৃহিণীরা, জ্যেঠিমারা। বধূরাও কিছু হয়ত করছিল। নতুন বধূ হয়ে ঊর্মিলা এসেছে। দেখতে পেলে তাকেও। একটু হেসে কথা কইলে সে। সুমিত্রাও একবার হাস্‌লে শুধু।

নীতিশ দেখলে বাড়ীশুদ্ধ ওরা সকলেই তার মুরুব্বী হয়ে গেছে কেমন করে। সেইরকমভাবেই তাদের নির্লিপ্ত মুখের দু'একটি ভাষণ প্রসাদী নির্মাল্যের মত খসে পড়ে, তারপর সকলেই কার্য্যান্তরে বা গৃহান্তরে চলে যায়।

পুরাতন আমলের বৈঠকখানার দিকে গেল সে। বৈঠকখানা সে রকম আর নেই। জাজিম ফরাস্‌ তাকিয়ার জায়গায় এসেছে দামী-দামী চেয়ার টেবিল। গোনা লোক আসে, বসে, চলে যায়। নিশ্চয়ই সেকালের মত 'মাসীমার কুটুম' জাতীয়রা আর আসে না। যারা শুয়ে থাকৃত বসে থাকৃত নির্বিকারভাবে নিঃসঙ্কোচে। কখনো মামলা, কখনো অসুখ, কখনো দেখা সাক্ষাতের বরাত নিয়ে আসত যারা! বৈঠকখানাও দু'ভাগ হয়ে গেছে।

বড়ভাই সতীশ বসেছিলেন সেখানে, বল্লেন, 'তারপর? হঠাৎ কি মনে করে?'

মেজজ্যেঠা মুখ তুলে আপাদমস্তক একবার দেখলেন, তারপর বল্লেন 'স্বদেশীয়ানা করছ, খদ্দর পরেছ। তারপর কাজকর্ম কি করছ আজকাল? একটা খবরও তো দাও না কারুকে!' প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষা না করেই তিনি খবরের কাগজ দেখতে লাগলেন।

সতীশ বল্লেন, 'অজ্ঞাতবাস করছিল বোধহয়।'

মেজজ্যেঠা হেসে উঠলেন কাগজখানা নামিয়ে, 'ঠিক বলেছিস্' বলে।

নীতিশের মুখ লাল হয়ে উঠল। সে বল্লে, 'কেন আমি তো সুধীকে চিঠি দিই।'

সতীশ নিজের রসিকতায় মেজকাকার সমর্থন পেয়ে খুব খুসী হয়েছিলেন, বল্লেন, 'তা জানতে পারি মাঝে মাঝে। এখন তাহলে কোথায় আছ?'

কেন কে জানে নীতিশ অপ্রস্তুতভাবে বল্লে, 'আমেদাবাদে রয়েছি।'

'আমেদাবাদে? সেখানে কি?' মনীশ এসে দাঁড়িয়েছিল, সে জিজ্ঞাসা করলে।

'সেখানে খাদিপ্রতিষ্ঠানে একটা কাজ করছি।'

মেজজ্যেঠা অবাক হয়ে আবার কাগজ রাখলেন। লেখাপড়া শিখে অসাফল্যের এমন অদ্ভুত স্পষ্ট উদাহরণ দেখা

গেল তাঁদেরই বাড়ীর ছেলেতে! অর্থাৎ সুতো কাটছে তকলিতে।

'কেন তোমার তো এম-এ, পাশ করা ছিল, বয়সও বেশী হয়ে যায় নি, পড়াশোনা ছিল, বিজ্ঞাপন দেখে সরকারী বেসরকারী অনেক কাজই তো পেতে পারতে। চেষ্টা করনি।' অবাক ভাবে বললেন মেজজ্যেঠা। 'আমাদেরও জানালে পারতে, যোগাড় করে দিতাম যাহোক।'

নীতিশের কান গরম হয়ে উঠেছিল। সে কিছু বলতে পারার আগেই সতীশ বল্লেন, 'ও চিরকালই ওই রকম। বড় বড় কথা ভাবে। ভাবছে, হয়ত দেশ উদ্ধার হচ্ছে এতে।'

সদাশয়ভাবে মনীশ বল্লে, 'এখানে চাকরী করনা, দেখব চেষ্টা? অবিশ্যি সরকারী চাকরী হবে না তবে আমার অন্য অন্য জায়গায় আলাপ আছে অনেকের সঙ্গে, প্রভাবও আছে।' তারপর বল্লে 'তা থাকবি কোথায়? বাড়ীতে তো একটা সিঁড়ির তলাও খালি নেই।' যেন সিঁড়ির তলা থাকলেই তাতে নীতিশকে দেওয়া যেত শোবার জন্যে।

নীতিশ অবাক হয়ে গেল। বেলাও অত্যন্ত লজ্জিত ও আশ্চর্য্যভাবে মনীশের দিকে চাইল। বড় জ্যেঠিমা পূজা করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। সাড়া পাওয়া গেল গলার।

সিঁড়ির তলার ঘরের কথা চাপা পড়ে গেল। সে জ্যেঠীমাকে প্রণাম করতে গেল। তিনি একটু পিছিয়ে গেলেন, 'ঐখান থেকেই কর্। তোর তো গাড়ীর কাপড়। তা ভাল

আছিস? অনেক দিন পরে এলি। খেয়েছিস কিছু? ও বৌমা ওকে চা' জলখাবার দাও।'

আতিথেয়তার পুরানো একটা ক্ষীণ ধারা তাহলে এখনো আছে। নীতিশ অবশ্য সেকথা মনে করবার সময়ই পেলে না। শুধু কথার আবহাওয়া বদলানোতে বাঁচল যেন। শুধু হেসে বল্লে, 'চা খেয়েছি, বেলা দিয়েছে।'

জ্যেঠিমাই বল্লেন, 'তা সুধীটাও এই সময়ে নেই। তোর সঙ্গে দেখা হলনা।' দেবর পুত্র বলে নয়—সুধীশের প্রিয় বলে তাঁর মনের কোনখানে একটু ঠাঁই তার ছিল যেন।

নীতিশ জিজ্ঞাসা করলে, 'কোথায় সে?'

'সে পুরী গেছে কদিন হ'ল, বুলু রমারা গেছে সেই সঙ্গে।'

তাহলে সুধীশও নেই!

কয়েক দণ্ডের মধ্যেই নীতিশ জানতে পারল সে একেবারে পুরোনো পচা কিছু। কোনো কিছু কৌতূহল প্রয়োজন জিজ্ঞাস্য তাকে কারুর নেই। তার আসাটা কেন সেইটেই শুধু একমাত্র প্রশ্ন সকলের কথার আড়াল থেকে উঁকি মারছে। এই বাড়ীর সমস্ত জগৎ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ভাষায় তাদের 'নিজের নিজের ঘটিবাটী সামলাতে ব্যস্ত।' অন্য লোকেরা এখানে একেবারে অবান্তর। অপ্রস্তুতের যেন সীমা রইল না তার। কাল ফিরে যাবে? ঠিক নয় সেটা? খুব যেন থিয়েটারী বা নাটকীয় ধরণের হবে কি? কিন্তু থাকবে কি করে? সকলেই তো 'তারপর?' 'কদিন আছ?' 'কদিন

খুটী আছে ?' এইভাবে কথা বলছেন। নরত অবাক চোখে চেয়ে আছেন।

পুরানো দলের মধ্যে চেনা যায় শুধু বেলাকে। দুপুর-আহারের সময় সে দেখলে বেলাকে ভালো করে। এক মুহূর্ত্তে সব বুঝতে পারলে। সেই উদ্ধত অহঙ্কারী বেলা যেন হঠাৎ কোথায় নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। আর খুঁজে পাবার উপায়ও নেই। পথহীন গতিহীন জীবন সামনে নিয়ে যেন সে চিরকালের মত হতবুদ্ধি হয়ে গেছে।

সিঁড়ির তলাতে নয়, সুধীশের ঘরে ওর জিনিষ রেখে বিছানা করিয়ে দেয় কে! বোধ হয় বেলা। তারপর আস্তে আস্তে বেলা গল্প করে ওর কাছে বসে। তার ছেলেটি নীতিশের কাছে বসে কথা কয়, খেলা করে।

অনেক গল্প করে। টুলুর কথা, দিদির কথা, টুলুর বরের কি কান্না। না, টুলুর কোনো ছেলেমেয়ে নেই। সে আর আসতইনা প্রায়। বুলু সুধীশের কথা বলে। সুধীশের এবারে ডাক্তারীর শেষ বছর, তারপর বিলেত পাঠাবেন জ্যেঠামশাই। অনেক কথা হয়। শুধু নিজের কথা কিছু বল্লে না, নীতিশও জিজ্ঞাসা করতে পারলে না।

দিন দু'তিনের মধ্যেই যেন কলের মত নীতিশ তার ফিরে যাবার সবুজ রংয়ের টীকিট কিনে গাড়ীতে উঠে বসল।

যে মোহময়ীর দুর্ব্বার মোহ, আকর্ষণ তাকে টেনে এনেছিল সে কে তা ও জানেনা। জননী ? জন্মভূমি ? ছোটবেলার স্মৃতি ?

বন্ধু ? কি তা সে জানেনা। জননী তো নয়ই, কেননা তিনি নেই, তবু এই এত প্রবল মোহ কিসের, ও ভাবে।

আস্তে আস্তে গ্রামের পর গ্রাম স্টেশনের পর স্টেশন তার জানা নাম, চেনা দৃশ্য আপনজনের মত বেশভূষা পরা অচেনা মানুষ নিয়ে সরে সরে যায়। কয়েক মাস আগের এমনকি তিন দিনের আগেরও সেই মোহময়ী দূরে দূরে, আরো দূরে গ্রাম নগর প্রান্তর নদী ছাড়িয়ে চক্রবাল সীমায় মিলিয়ে যেতে লাগল।

নীতিশ চুপ করে দেখে। সেদিনের কবিত্বময় মোহের কথা ভাববার কোনো জায়গাও যেন তার অন্তরে আর নেই।

শুদ্ধ খাদি ভাণ্ডারের তাক ভরা নানাবিধ সৌখিন খদ্দর, মোটা খদ্দর, শুদ্ধ খদ্দর, মিশ্র খদ্দর আর তার প্রকাশিত বই আর তার ক্রেতা ও ক্রেত্রী। অবশ্য খুব বেশী নয়।

এসে দাঁড়াল প্রতুল ও বীণা।

তাক থেকে জিনিষ নিতে পিছন ফিরেই নীতিশ বল্লে, 'আইয়ে।'

তারপর সুমুখ ফিরে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। অন্য ক্রেতাদের বেচাকেনার পর, চমৎকার জামার টুকরা কয়েকটা সংগ্রহ করে বীণা ও প্রতুল উঠল, প্রতুল বল্লে, 'এবারে চল্ তোর বাড়ী।'

ছোট সরু একটি সিঁড়ি দোকানের পাশ দিয়ে উঠে গেছে তেতলা অবধি। সেইখানে একখানি ঘর, একটি দালানে চিক

ফেলা,' একটি ছোট রান্না ঘর, কাঠের আড়াল করা স্নানের ঘর, সামনে ছাত।

নীতিশ মৃদু হেসে বল্লে, 'এই আমার বাড়ী। তারপর কি করে এসে পড়লি?'

প্রতুল বল্লে, 'কতদিন তুই যাসনি দেখতে এলাম তাই।'

নীতিশ বীণার দিকে চেয়ে বল্লে, 'তা ওঁকে কোথায় পেলি?'

'ওযে কিষনগড়ে গিয়েছিল গরমের ছুটীতে।'

নীতিশ হেসে বল্লে, 'ওই সিমলে পাহাড়ে! কিন্তু সত্যি সত্যি কোনো ভালো জায়গায় গেলেন না কেন? ঠাণ্ডা জায়গায়? আপনাদের স্কুলের মেমসাহেবরা তো যায়। এই আবু পাহাড়ের মতন কোথাও?' বীণা বল্লে, 'প্রথমত আমি মেমসাহেব নই, তারপর আবু এবং গরমের ছুটী তো পালাচ্ছে না, প্রতি বছরই আছে, গেলেই হবে। তৃতীয়, এখানে আপনাদের খদ্দরের আবহাওয়া দেখতে বেশী কৌতূহল হ'ল।'

'অর্থাৎ এসব পালাতে পারে। তা ভালো চলুন সব দেখিয়ে দোব।' নীতিশ হাসলে।

হঠাৎ প্রতুল বল্লে, 'তা' দেশ থেকে ফিরে না দিলি চিঠি, না করলি দেখা! কি রকম লাগল?'

নীতিশ বল্লে, 'ভালোই লাগল।'

'অর্থাৎ?'

নীতিশ বল্লে, 'সাধুদের নাকি একটা নিয়ম আছে সন্ন্যাসের

বারো বছর পরে একবার জন্মভূমিতে ফিরতে হয়। কেন তাদের এই নিয়ম তা অবশ্য জানিনা। ফিরে এসে আমার মনে হল বোধহয় এটা দরকার হয়, নইলে মোহ থেকে যায়।'

বীণা হাসলে, বল্লে, 'অর্থাৎ আপনি সাধু হয়ে উঠছেন ক্রমশঃ!'

একটু হেসে সে বল্লে, 'তা বলতে পারেন। যেভাবেই হোক।'

তারপর প্রতুলের দিকে চেয়ে বল্লে, 'জানিস্ নিশ্চিত স্বচ্ছন্দ জীবন যাত্রা কি অদ্ভুত জিনিষ! মানুষ একেবারে ত্রস্ত হয়ে থাকে। যেন কি বুঝি 'গেল গেল' ভাব সব সময়।'

কথাগুলো যেন স্বগত উক্তি। বুঝতে না পেরে প্রতুল ও বীণা চুপ করে রইল। তারপর সে বল্লে, 'সুধীর সঙ্গে দেখা হ'ল না। তোর বেলাকে মনে আছে? মেজ কাকার বড় মেয়ে, খুব সৌখিন ছিল? সে একেবারে যেন বদলে গেছে।' বিধবা হয়েছে বলতে পারল না।

'কেন?' প্রতুল আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

'শুনলাম কিছুদিন আগে তার স্বামী মারা গেছে।'

নীতিশ উঠে পড়ল, বল্লে, 'চল তোমাদের আবার ফেরবার সময় হবে, কি দেখবে দেখিয়ে আনি।'

পথে চলতে চলতে হঠাৎ বীণার দিকে চেয়ে বল্লে, 'আর জানেন, আপনাদের কিন্তু এখনো পোষাকটাই সব, এই রাজবেশ, এই যোগীবেশ। অন্য সব বেশের কথা আর বলব

না। 'ওখানেও দেখলাম শুধু রাজবেশ ছেড়েই বেলা একেবারে দীনহীন হয়ে গেছে। আর অন্য সকলের ঠিক সেই অনুপাতে কি রাজার মত মেজাজ। এক পোষাক পরিচ্ছদই সাধারণ মানুষকে কি-না করে দিতে পারে!'

বীণা বেলাকে দেখেছিল, আলাপও ছিল স্কুলে, সে চুপ করে রইল।

প্রতুল একটু চুপ করে রইল, তারপর বল্লে, 'পোষাকটা তো নিজের ইচ্ছেমত ত্যাগ বা ভোগ করে না ওরা, তাই অত দীনতা দেখতে পাওয়া যায়। ইচ্ছে করে যে কিছু ছাড়ে, সে যে তার চেয়েও বড় কিছু পেয়ে ছাড়ে। সে তাই দীন হয় না।'

নীতিশ চকিত হয়ে বল্লে, 'ঠিক বলেছিস্।'

প্রতুল বল্লে, 'আজকে আমাদের সঙ্গে যাবি?'

বীণা উৎসুক হয়ে চাইল। প্রতুল বল্লে, 'সেদিন কাবেরী-বাঈ আর মোহনলালজীও তোর কথা জিজ্ঞেস করছিলেন।'

নীতিশ বল্লে, 'আমার কাজে তো ছুটী নেই। দেখি। কাবেরীবাঈ তো পাশ করে বেরিয়েছেন না? যমুনাবাঈ গঙ্গাবাঈরা কেমন আছেন? কাবেরীবাঈয়ের কি বিয়ে হয়ে গেল নাকি পল সাহেবের সঙ্গে?'

প্রতুল বল্লে, 'বিয়ে? কই জানি না তো। পাশ করেছেন বটে, চাকরী করছেন নাসিরাবাদেই। মা মাসীরা এখানেই আছেন। ওর মা মাসী ওখানে বিয়ে হতে দেবেন না মনে হয়, ওরা ঘোর হিন্দু যে!'

তারপর বল্লে, 'চল্, আশ্রমের কাছে এসে পড়েছি।'
মৌন ও মৃদুভাষী জনতার মধ্যে তারাও মিশে গেল।

মাস খানেক কেটে গেছে।

কেনাবেচা পড়াশোনার মাঝখানে চিঠি দিয়ে গেল পিয়ন।

সুধীশের চিঠি। অনেক খবর অনেক কথা। তার মাঝে বড় খবর সে পাশ করেছে। আর অন্য কথা তাকে বিলাত পাঠানো হচ্ছে।

নীতিশ চিঠি রাখল একবার। তারপর আবার পড়তে লাগল—সুধীশ লিখেছে, সে বিলাতের কথায় প্রতিবাদ জানিয়েছে, বলেছে যদি ঐ টাকাতে দুজনের খরচ সম্ভব হয় তো সে নিতুদাকে নিয়ে যাবে। নইলে যাবে না।

নীতিশ একলাই লাল হয়ে উঠল। তাকে কি দরকার! সুধীটা অত্যন্ত ছেলেমানুষ।

আবার পড়তে লাগল। 'মনীশদা আর প্রবীরদা কিছু করে টাকা দেবে যে খরচটা আমাদের কম পড়বে। তুমি এলেই পাশপোর্টের জন্য লিখব, আর সব গোছগাছ করব। শীঘ্র খবর জানিও, আর চলে এসো।'

আর পড়তে ইচ্ছে হ'ল না। কান মুখ যেন গরম হয়ে উঠল তার। মানুষ কত সরলভাবে ভালবেসেই না জেনে মানুষকে আঘাত করে।

অভিমানহীন ক্ষোভহীন মনে হয়েছিল নিজেকে। 'কিন্তু

দেখতে পেল তা নয়। চিঠিখানা কি ছিঁড়ে ফেলে দেবে? জবাব দেবে না? না কোথাও লুকিয়ে রাখবে? চিঠিটা যেন আর দেখতে পারা যাচ্ছে না।

খরিদ্দার এলো কয়েকজন। নীতিশ বাঁচল। দরকারের চেয়ে বেশী জিনিষ ছড়িয়ে দেখায়, সৌখিন দামী, কম দামী। বই কিনবেন একজন। বই ও পড়তে বলে, এইটে পড়ুন, কত সহজ সরল-স্বাস্থ্য পালনের নিয়ম মহাত্মাজীর। আত্মকথা? সত্যের প্রয়োগ? গুজরাটী? হিন্দী? ইংরেজী? আছে সব আছে। অন্য বই? গীতার ভাষ্য? সব দেখুন না।

১৪

এমন সময় এলেন বজরং সহায় আর তাঁর বন্ধু একজন। দেবীপ্রসাদ। খুসী মনে নীতিশ বল্লে, 'আসুন, আপনি কবে এলেন ?'

'আজই। আপনার সঙ্গে কথা আছে কাজও আছে, কখন আপনার সময় হবে ?' বজরং সহায় বল্লেন।

সাধারণ বন্ধুমাত্র কিন্তু মনের এমন অবস্থা যেন মনে হল পরম বন্ধু।

সে বল্লে, 'বসুন একটু। আর একজন আসবে, বিকেলের পালা তার। এখন ছুটো, সে তিনটেয় আসে।'

'আজকে মহাত্মাজীর প্রার্থনাতে যোগ দেব। আরো অনেক কথা আছে, শোনা যাবে। এইজন্যে আমরাও এসেছি, আপনাকেও নিতে এলাম। আপনি সেই অবধি এইখানে আছেন আর কোথাও যাননি ? কাজ কেমন লাগছে ?'

'ভালোই লাগছে। অনেক রকমের লোকের সঙ্গে আলাপ হয়, বই অনেক। প্রার্থনাতেও মাঝে মাঝে যাই যখন বিশেষ কিছু কথা হয়। তা ছাড়া আমাকে হরিজন স্কুলে এক ঘণ্টা করে পড়াতে হয় রাত্রে।'

দেবীপ্রসাদজী বল্লেন, 'আপনার ভালো লাগছে এই সব কাজ ? এই দূর বিদেশে।'

'নিশ্চয়। এত সব রকম দেখি যে মনে হয় আমরা কিছু জানি না, জানতুম না। শুধু নিজেরা বড় বা ছোট চাকরী করে নিজেদের নিয়েই থাকতুম। সামান্য ডাল ভাত বা রুটী খেয়ে, তেলের কুপী-জ্বালা একটা ঘরে গরমে ছেঁড়া চেটাই পেতে আর শীতে মোটা দু-সুতী গায় দিয়ে যারা দিন কাটায়, আমাদের রাস্তা পরিষ্কার করে—নোংরা জঞ্জাল তুলে, আমরা তাদের কোনো কিছুই জানি না।'

বজরং সহায় বল্লেন, 'ইনি দেবীপ্রসাদজী কিন্তু অন্য দলের সবটাই এঁর অহিংস নয়। এঁর ধারণা, একটু একটু করে বদল হতে অনেক দেরী হবে, বিপ্লব দরকার। ঐ শ্রেণীর লোকেদের লেখাপড়া শিখে ভাবতে শিখতে অনেক দেরী, ততদিনে ওদের জীবন শেষ হয়ে যাবে, ওদের এখনি জীবনের প্রাপ্য পাওয়া উচিত।'

নীতিশ চুপ করে রইল। তারপর বল্লে, 'তা সত্যি। কিন্তু তার রাস্তা কই? পথ কই? মহাত্মাজী তো একটা পথ দেখিয়েছেন!'

'আমারো তাই মনে হয়'—বজরং সহায় বল্লেন।

'আপনাদের দেশেই আমি লেখাপড়া শিখেছি। জানেন সেখানে আপনাদের রামকৃষ্ণ পরমহংস বলেছেন, 'যত মত তত পথ'—না?' দেবীপ্রসাদ বল্লেন একটু হেসে।

নীতিশ বল্লে, 'আপনি বাংলা জানেন?'

'বুঝতে পারি একটু একটু। পড়তেও পারি সামান্য, বলতে ভাল পারি না।'

নীতিশ হেসে বল্লে, 'হ্যাঁ, তাঁর যত মত তত পথ বলা' যায়। তা পথও তো সকলের পক্ষে সব সুগম নয়। তাঁর বই পড়লে তার উপমা পেতেন।'

দেবীপ্রসাদও হাসলেন। বল্লেন, 'আসলে কি জানেন, মত একটা যদি মনে বাসা বাঁধে সেটাকে তাড়াতে সময় লাগে। কিন্তু আরও ভাল পথ পেলে নিশ্চয় সে যাবে।'

'মহাত্মাজীর পথই তো রাজপথ, এখনকার পক্ষে সকলের মতে। নয়?'

'নিশ্চয়। কিন্তু মানুষের জীবন তো মাত্র ষাট সত্তর বছর কিম্বা আরো কম। যারা কিছুই পায়নি তারা তো ও পথেও কিছুই পাবে না জীবনে।'

'তাদের পরবর্তীরা পাবে। অন্য পথই বা কই?' বজরং সহায় বল্লেন।

'এখন চলুন, আপনার লোক এসে গেছে।'

প্রার্থনা শেষ হলে নীতিশ বাড়ী ফিরল। মনটা একটু হালকা হয় কথায়-বার্তায়। কিন্তু চিঠির জবাব কি দেবে? কি করে সুধীশের শুভ সরল ইচ্ছাকে আঘাত না দিয়ে এড়িয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু চাঁদা করা টাকা নিয়ে পড়তে যাওয়া এতদিন পরে!

সুধীশের চিঠির জবাব এলো। সুধীশের পাশের খবরে, বিলাত যাওয়ার খবরে আনন্দ জানিয়ে নীতিশ লিখেছে। তারপর লিখেছে,—

ভাই, তুমি আমাকে না নিয়ে বিলেত যাবে না জানিয়েছ। তাই দাদারা কিছু করে টাকা দেবেন, জ্যেঠামশাইও মত দিয়েছেন।

এমন একটা সময় ছিল, ক'বছর আগের কথা বলছি, তখন হয়ত ঐ কথা শুনলে কৃতার্থ হয়ে যেতাম, ক্রীতদাসের মত কেনা হয়ে থাকতাম হয়ত। আর তখনকার মত অনুসারে 'মানুষ' হয়ে আসতাম—কৃতী হয়ে আসতাম। বড় লোকের মত, অভিজাতের মত থাকা লোকের সংখ্যা একটা বাড়াতাম। আর সেই রকম ভাবে খুব সুখীও হতাম! জানো, তুমি যখন ছোট আমাদের বড়দের মধ্যে তর্ক হত আভিজাত্য নিয়ে। একটু সমৃদ্ধ বাড়ীতে জন্মেছি বলে মনে বড় অহঙ্কার তখন সকলেরই। আভিজাত্যের মহিমা ও মাত্রা বিচার হ'ত। কখনো মনে হ'ত বিলিতী ধরণে থাকাকেই বুঝি আভিজাত্য বলে, কখনো মনে হ'ত সেকেলে বনেদী চালকেই বুঝি বলা যায়, কখনো মনে হ'ত লেখাপড়া শেখাকে, বড় চাকরী করাকে! নানারকম ভাষ্য হ'ত তার।

এখন বুঝতে পারি আভিজাত্য বলে যা ভেবেছি আমরা, তা হচ্ছে সকলের সঙ্গে জনসাধারণের সঙ্গে এক না হওয়া আসলে। নিষ্ঠুর সীমাহীন অহঙ্কার সেই আভিজাত্যের সাধারণ লক্ষণ। যে নিজেকে নিয়েই থাকে অহঙ্কার ছাড়া আর তার কিছুই নেই। তা সেটা যা নিয়েই হোক, পদ-মর্য্যাদা, অর্থ-সম্পদ, বংশ, নাম। সত্য করে আভিজাত্য কি তাহলে? সেও

একলা, একান্ত একাকী কিছু। সংযত সূক্ষ্মরুচি সৌজন্য মহিমাময় ব্যবহারের মধ্যে দিয়েও সে নিজের ছোট্ট লুকানো অহঙ্কার নিয়ে একা। জ্ঞানের, ধর্মের, কর্মের, ব্যবহারের যারই হোক সেই অহঙ্কার। তখন যখন মোহ ছিল আভিজাত্যের মনে হ'ত ওটা বুঝি ওর একটা বড় গুণ। আজ মনে হয় সকলকে যে নিজেদের থেকে পৃথক করে রাখল তার মহিমাটা কোনখানে? গ্রাম্যভাবে স্থূল কতকগুলো বিলাস ও প্রয়োজন দিয়েই সে তফাৎ হোক, আর, সূক্ষ্মভাবে শুচিভাবে নিজেকে সুদূর করে রেখেই হোক ও দুই-ই পৃথক হয়ে থাকাই তো। সবটাই অহংকারেরই মহিমা। বলতে পারা যায় পরমহংস-দেবের ভাষায় 'ভক্তের আমি' 'দাস আমি'র অহংকারও আছে তো! সে যাক্।

তাই চাঁদা করে টাকা সাহায্য নিয়ে আর ওরকম মানুষ হবার মতন মন আজকে নেই। কোটী কোটী দীনদরিদ্র সাধারণ না হোক, অসংখ্য মাঝারি সাধারণের সঙ্গে আজ মিশে গেছি। বুঝতেও পেরেছি। মনে হয় এইটেই আমার ঠিক জায়গা। অবশ্য এদেরও সকলেরই লোভ আরো কিছু হবার, পাবার। কিন্তু সে তো মানুষ নিজেকে, নিজের অবস্থাকে বারবার অতিক্রম করে যেতে চাইবে,—তার স্বভাব। অবশ্য এও জানি না এইটেই আমার ঠিক পথ কিনা।

তুমি শিক্ষিত হয়ে এসো। 'মানুষ' হওয়া কাকে বলে জানি না। সকলের মত আর আদর্শ ভিন্ন। তবে তুমি যে

দেশে যাবে সেখানে তুমি অনেক রকম মানুষ দেখতে পাবে হয়ত কিছু আদর্শ খুঁজে পাবে।

আমার ভালবাসা নিও। ইতি নিতুদা।

অভিমানের আভাষ বাষ্পও নেই, বেশ সহজ মিষ্টি চিঠি। তবু সুধীশের যেন মনে হয় নিতুদা কেন এত আলাদা হয়ে যাবে তার থেকেও। যেন একটা অদৃশ্য কি ব্যবধান এসেছে।

যাই হোক তার আর যাওয়ার ইচ্ছা হ'ল না। মনে মনে ভাবল, আমার টাকা হলে সেই টাকাতে নিতুদাকে নিয়ে যাব। তখন তো আর চাঁদা করা টাকা বলতে পারবেনা। হাসপাতালে চাকরী নিল সকলকে আশ্চর্য্য করে দিয়ে। ওর বোকামী দেখে ভাইয়েরা অবাক হলেন এবং দুঃখিত হলেন।

বজরং সহায়ের ও দেবীপ্রসাদের কাজের কথা জানা গেল। মহাত্মা গান্ধীর নুন তৈরীর যাত্রায় ওরাও যাবার জন্যে তোড়জোড় করছে।

নীতিশও দলে মিশল।

হঠাৎ বীণার একটা চিঠি এলো। জিজ্ঞাসা করেছে, নীতিশ কি যাবে দাণ্ডীতে, ওকে নিয়ে যেতে পারবে কি? যদি পাবে তো ও তৈরী হয়ে আসবে।

নীতিশ অবাক হয়ে গেল। ভাবতে বস্‌ল কি লিখবে। দুটো দিন ভাবতে কেটে গেল। তৃতীয় দিনে বীণা এসে দাঁড়াল, খাদি ভাণ্ডারে।

নীতিশ বল্লে, 'আপনি ?'

অপ্রস্তুত ভাবে একটু হেসে বীণা বল্লে, 'চিঠির জবাব নিতে এলাম।'

অত্যন্ত অপ্রতিভ হয়ে নীতিশ বল্লে, 'হ্যাঁ, দেরী হয়ে গেল। কিন্তু কি করে আপনি যাবেন এই ভিড়ে ?'

'কেন, যেমন করে যাওয়া-আসা করি।'

নীতিশ হাসলে, 'সে তো জানি। কিন্তু না জানা দেশ, আপনার লোক কেউ সঙ্গে নেই।'

মৃদু হেসে বীণা বল্লে, 'আজমীরও না জানাই ছিল তো। আর সেখানে কেউ আপনার লোকও নেই। বেশ তো কাটছে দিন।'

'সে হ'ল কাজের জায়গা।' নীতিশ অপ্রস্তুত হয়ে বলে।

'অর্থাৎ কাজের জায়গায় আপনার লোক সঙ্গী না হলে চলে! তা দাণ্ডীতেও যা হোক কাজ করবার চেষ্টা করব বলেই যাবার ইচ্ছে। শুধু নিয়ে চলুন না সঙ্গে। যাবেনই তো।'

'তাতো যাব, কিন্তু'—নীতিশ থেমে যায়।

'অর্থাৎ আমাকে নিয়ে যেতে ভয় হচ্ছে ?'

'না, না, ভয় কি ?'

'তবে অস্বস্তি ?'

'তা বলতে পারেন। প্রতুল চলুক না ? বেশ হয় তাহলে।'

এইবার বীণা হাসল, 'অর্থাৎ আমার 'বডিগার্ড' একটি না হলে আপনি সাহস করছেন না। ভয় নেই। আমি আপনাকে ভয় করি না মোটে, আশা করি আপনিও আমাকে ভয় করেন না।'

নীতিশ লাল হয়ে উঠল, বল্লে, 'না ভয়-টয় করি না কারুকে। চলুন যাওয়া যাবে। কিন্তু অসুবিধা হলে আমি জানি না।'

'হোক অসুবিধা, ঘর ছেড়ে এত দূরে এসেও এটা দেখতে পাব না? যাব আপনাদের সঙ্গেই। প্রতুলদার ছুটী কই? তা ছাড়া কোনো বিপদে পড়লে ওর মুস্কিল, মা বোন ভাই আছেন। আপনিও নিরঙ্কুশ, আমিও মুক্ত।'

'আপনারও তো মা আছেন, ভাইয়েরা আছেন।'

'আছেন। কিন্তু আমি তো তাঁদের জীবিকাও নই, অন্নও নই। আমি বরং তাঁদের দায় বা ভার। বাংলায় একটা কথা আছে, মার মুখেই শুনেছি, 'এসো লক্ষ্মী যাও বালাই।'

'সে আবার কি?' নীতিশ আশ্চর্য্য হয়ে হাসলে।

'জানেন না? মেয়েলী কথা, জানবেনই বা কি করে! আমরা মেয়েরা অনেকটা এইভাবেই জীবন কাটাই। কখন যে কোথায় 'লক্ষ্মী' আর কোথায় 'বালাই' হয় বুঝতেই পারে না তারা।'

'চলুন, এবারে যাওয়ার ব্যবস্থা করুন।'

ধরমশালা, আশ্রম, তারপর থার্ডক্লাস মেয়েদের গাড়ীতে।

তারপর মেয়েদের দলে বীণা কখন মিশে গেল। আর নীতিশের রক্ষণাবেক্ষণের বা সতর্ক লক্ষ্যের প্রয়োজনের সীমানাও কখন কেটে গেল তারি মাঝে। অসংখ্য নানা দেশীয় যাত্রী ও যাত্রিণীর মাঝে তারাও একদল। সহযাত্রী তাদের মতই, ওরাও পরস্পর অনাত্মীয়, মুখচেনা মাত্র কিছুদিন আগে। উচিত অনুচিত, ভাই বোন, স্বজন বন্ধু, আত্মীয় অনাত্মীয় সেকথা ওঠে না। যাত্রার লক্ষ্য ওদিকে নেই। যাত্রীদেরও লক্ষ্য ওদিকে নেই! যেন দুর্গম পথে তীর্থযাত্রীরা চলেছে। কারো জলের দরকার, কারো জায়গার, কারো ছেলে শোবার, কারো বা খাদ্যের, যে যা পারে সাহায্য করছে। মনেই ওঠে না এ ভালো ও মন্দ, এ দরিদ্র ও অভিজাত। আর এই তৃতীয় শ্রেণীর মাঝে বিশিষ্ট অভিজাতও কেউ নেই। সবাই জাঠ, চাষা, পটেল (মোড়ল) মজুর কর্মীদের ঘরের মেয়ে। কেউ বা অতদূর যাবে কেউ বা যাবে না কিন্তু মহাত্মাজীর নাম, এই 'নুনের' কথা তারাও সবাই জানে। সহজ সরল বিস্ময়ে তারা সেকথা আলোচনা করে।

গাড়ী বেশীক্ষণ থামলে নীতিশ এসে জানলার কাছে দাঁড়ায়, জিজ্ঞাসা করে, 'কি লাগবে বা কি চাই ?'

হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, 'আচ্ছা, এত সাহস বিশ্বাস আপনার কোথা থেকে হ'ল। আমাকে চেনেন না, আমার বন্ধুদের না। আমার ভারি আশ্চর্য্য লাগে। নিন্দাকেও তো লোকে ভয় করে।'

বীণা হাসলে, তারপর বল্লে, 'তা করে। কিন্তু ছোট বেলায় বাবা খুব প্রশ্রয় আর আদর দিয়ে মানুষ করে ছিলেন, অর্থাৎ মাথাটা বিগড়ে দিয়েছিলেন। তারপর লেখাপড়া শেখালেন যে-সব স্কুলে তাও মিশনারীদের স্কুল। সেখানে আর যা তাদের উদ্দেশ্য থাকে থাক, দু'একটা জিনিষ ভালো আছে। সত্যিই তারা সকলকে সমান মনে করে, ছেলেমানুষীকে ধমক দেয় না, অন্যায়কে শাস্তি দেয় কিন্তু দুরন্তপনাকে শাস্তি দেয়না। ছোট ছেলেমেয়েকে তাদের বড় মনে করার অভ্যাস নেই আমাদের মত। কাজেই নির্ভয় ভাবেই বড় হলুম। নিন্দার ভয়ও জন্মাল না মনে।

তারপর হঠাৎ যখন বাবা মারা গেলেন তখন আই-এ পড়ি। দেখলাম তখন বাড়ীতেই ভয় করবার দিন এলো। কিন্তু নির্ভয় হয়ে গেছি স্বভাবে, ভয় করা আর মনেই এলো না। উল্টে দেখি লোকেরা আমাকেই ভয় করে।'

বীণা হাসতে লাগল। 'সেটাও অবশ্য উভয়তই ভালো লাগল না। যান, গাড়ী ছাড়লে।'

বল্লে, 'না, জল নিচ্ছে, দেরী আছে। তারপর?' 'তারপর আর কি? ঐ উত্তরাধিকারটাতো বাবা দিয়েই গিয়েছিলেন নির্ভয় হবার, আর কিছু পাই বা না পাই। আজকে বাইরে বেরিয়ে বুঝতে শিখেছি, সমাজে যখন আমাদের আর কিছুই অধিকার দেওয়া হয়না, কোনো দাবীই নেই তখন ভয়ে ভয়ে লাভ বা ক্ষতি কোনোটাই পরম বা চরম বলে মনে

না করলেই ভালো হয়। ক্ষতি হতে পারে। কিন্তু কত ক্ষতি সে? নিজেকে মানুষ বলে মনে করলে মেয়েমানুষ না ভেবে, সে ক্ষতি একদিন আপনিই পূরণ হয়ে যাবে, নয়ত লাগবে না গায়ে।'

নীতিশ একটু হেসে বল্লে, 'কিন্তু ভয় আছে, দুর্জ্জন দুর্বৃত্তও আছে বাইরে।'

বীণাও হাসলে, বল্লে, 'তা' আছে। সজ্জনও আছে।'

'গাড়ী ছাড়ছে। আচ্ছা আবার আস্‌ব।' নীতিশ নিজের গাড়ীতে চলে গেল।

তার মনে হয় রবীন্দ্রনাথের—

যে নারী বিচিত্র বেশে মৃদু হেসে খুলিয়াছে দ্বার
থাকিয়া থাকিয়া

... ...

তারি সেই চাওয়া সেই চেনার আলোক দিয়ে আমি
চিনি আপনারে।

মেয়েদের সে দেখেনি এমনভাবে। যাদের দেখেছে তারা হয় সম্পর্কীয়া নয়ত সম্পর্ক হতে পারে। সবটাই সম্পর্কের সাতরঙা বেলোয়ারী কাচের মাঝ থেকে দেখা ও চেনা। অনাত্মীয় হৃদ্যতার নির্ম্মল আলো সেখানে ছিল না।

আশ্চর্য্য হয়ে মনে হয় এই নির্ভীক মেয়েটির কথা আর তার নিজের জীবনের ভয় দিয়ে আরম্ভর কথা। যেন এতদিন

পরে ওকেই বলতে ইচ্ছে করে, আজন্ম সেই সকলকে ভয় করার কথা, সকলের সেই মমতাহীন অবজ্ঞার কথা, ভালবাসা প্রশ্রয়হীন এক দীন ত্রস্ত শৈশবের কথা, যে ভীরুতা নির্ভয় বলিষ্ঠ মনে কোনো কাজ করতে শেখায়নি তাকে। বলতে ইচ্ছে করে, সে কারুকে আপনার করতে, বিশ্বাস করতে, ভালবাসতে শেখেনি। মাথা উঁচু করে কথা কইতে শেখেনি, সহজ ভাবে হাসতে সাহস করেনি। আর জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করে, তুমি সে পেরেছ, কি করে কেমন করে পারলে ? শুধু সেই ছোটবেলার ভালবাসা আর প্রশ্রয় থেকেই এত পেলে ? এত ভরসা, সাহস, নির্ভীকতা ? এত বিশ্বাস নিজের ওপর, অজানা অচেনার ওপর ? আরো তুচ্ছ, বড় কত কথা বলতে ইচ্ছে করে, শুনতে ইচ্ছে করে পরম বন্ধুর মত। প্রেমের কথা নয়, ভালবাসার গুঞ্জন নয়, শুধু সহজ শ্রদ্ধায় আশ্চর্য্য হয়ে তার নির্ভয় নির্ভরতার আশ্চর্য্য কাহিনী শুনতে ইচ্ছে করে। আজ যেন 'তারি সেই চাওয়া সেই চেনার আলোক দিয়ে আমি চিনি আপনারে'—বলতে ইচ্ছে ক'রে।

কিন্তু কিছুই বলা হয় না। গাড়ী ছোট বড় স্টেশনে থামে। নীতিশও বারবার নামে, জানলার পাশে দাঁড়ায় কিন্তু চিরকালের ভীরু মূক মন নির্বাক হয়ে থাকে। কোনো কথাই খুঁজে পায়না। শুধু জিজ্ঞাসা করে, 'জল চাই ?' 'চা চাই ?' 'কি চাই ?'

পথ শেষ হয়ে গেল যাত্রার। তার মনে হতে লাগল এত

শীঘ্র শেষ হয়ে গেল? থার্ড ক্লাশের ভিড়, গরম, নোংরামি তবু মনে হয় আরো একটু দেরী হ'ল না কেন? এমন করে আর কখনো কোনোদিন কোথাও যাবে না হয়ত, এই যাত্রা এই-খানেই সুরু হয়ে এইখানেই শেষ হ'ল হয়ত; তবু একটু গাড়ী লেট হ'ত যদি।

ভিড় ঠেলে পথ করে বেরিয়ে আসে সবাই।

সহসা সামনে পড়েন মোহনলাল। নীতিশ অবাক আশ্চর্য্যে এগিয়ে যায়। আগ্রহ ভরে কাছে নিয়ে দাঁড়ায়। মোহনলালজীও আশ্চর্য্য হয়ে খুসী হয়ে ওঠেন।

'তারপর, আপনি কি করে?' নীতিশ জিজ্ঞাসা করে।

'আমিও তো সেই কথাই জিজ্ঞাসা করব ভাবছি আপনাকেও?'

'চলুন, আমাদের একটা দল আছে, সেইদিকে যাই। আপনার সঙ্গে কেউ আছে নাকি?'

'না, আমি একলা। দেখতে এলাম। শুনলাম, শিউশরণ নাকি চাকরী ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছে। সেও আসবে, তাই আরো দেখতে এলাম। আমাদের 'ঈসাই'দের মধ্যে তো চট্ করে কেউ চাকরী-টাকরী ছাড়ে না! তাতে ভালো কাজ পেয়েছিল।'

'সত্যি? খুব ভালো তো। তা ছাড়লেন বোধহয় ভাল লাগছিল না',—নীতিশ বল্লে।

'তাই হবে। চলুন, কোন্‌দিকে যাব!'

•বীণা, বজরং সহায়, দেবীপ্রসাদ, আরো পথের চেনা, কাজের চেনা খদ্দরওয়ালা চারদিকে ছড়িয়ে ছিল।

মোহনলালজীর বীণাকে চেনা ছিল, নমস্কার করে তার আসার কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

বীণা বল্লে, 'এমন নুন তৈরী তো আর জীবনে দুবার হবে না। দেখব না? কি বলেন?'

'ঠিক বলেছেন। আমি অত ভাবিনি। তবে কেমন ইচ্ছে হল তাই এলাম। জানেন তো আমাদের ঈশাইরা ক্রিশ্চানরা এসব ব্যাপারে একটু উদাসীন ভাবেই থাকে, তবে এখন একটু সচেতন হয়েছে। কাবেরীবাঈয়েরও আসবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ছুটি পেলনা, চাকরী করছে। সত্যিই তো এমন ঘটনা তো রোজ হয় না',—মোহনলালজী বল্লেন।

বীণা বল্লে, 'এলে বেশ হত। আর মনে হয় এতো শুধু নুনের কথা নয়, আহার্য্যে একান্ত দরকারী নুনের মতই জীবনে স্বাধীনতার কথা। আসলে মনে হয় মহাত্মাজী যেন নুনের রূপকে জানাচ্ছেন আমাদের প্রতি গ্রাসের আহার্য্যে নুনের মতই স্বাধীনতাও জীবনে অপরিহার্য্য। নুনহীন তরকারীর মত স্বাধীনতাহীন জীবনও বিস্বাদ। এই যেন এর রূপক ভাব।'

সকলেই ওর মুখের দিকে চাইল। নীতিশও আশ্চর্য্য হয়ে চাইল।

বজরং সহায় বল্লেন, 'আপনার ব্যাখ্যাটা তো বেশ।'

বীণা একটু অপ্রস্তুত হয়ে বল্লে, 'চলুন, কোনদিকে যেতে হবে।'

১৯

সুধীশ নিজের ব্যাঙ্কের খাতা দেখছিল।

ব্যাঙ্কে মাত্র হাজার দেড়েক টাকা জমেছে। কিন্তু সেতো বিলাতের খরচের পক্ষে কিছুই নয়। ক'বছর লাগবে তাওতো জানা নেই। খানিকটা টাকা জমলে তবে সে নীতিশের কাছে গিয়ে প্রস্তাব করে ধরে আনতে পারবে হয়ত।

বাইরের ঘরে ডাক পড়ল।

বৈঠকখানায় তিক্তমুখে সতীশ বসে আছেন। গিরীশ হরিশও বসে আছেন গম্ভীর মুখে। সে ঘরে ঢুকল।

সতীশ একটু অদ্ভুতভাবে বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বল্লেন, 'মহাত্মাজী যে জেলে গেলেন!'

সুধীশ আশ্চর্য্য হয়ে চাইল। তারপর বল্লে. 'সেতো ১৯৩১-শেই গেছেন।'

'সে মহাত্মা নয়, উনি হচ্ছেন আমাদের নিতু মহাত্মা!' হরিশ বুঝিয়ে দিলেন।

সুধীশ অবাক হয়ে চুপ করে গেল। সুধীশ নীতিশের ভাই নয়, ওদের চেয়ে নিকটতম সম্পর্কীয়ও কেউ নয়, তবে ওকে ডেকে এভাবে বলার অর্থ কি? অবশ্য সে কথার তাৎপর্য্য সতীশ জানেন, হরিশ জানেন, গিরীশ জানেন, বাড়ী-শুদ্ধ সবাই জানে। সুধীশই এ-বাড়ীতে এখন একমাত্র লোক যে তাকে

ভালোবাসে, তার কথা ভাবে এবং তা সুধীশও জানে। তবু এরকমভাবে 'চাঁদমারী' করে বল্লে আশ্চর্য্য হয়ে যায়। অবাক হয়ে যেন ভাবতেও পারলে না, সে দুঃখিত হ'ল, না, আশ্চর্য্য হল, না, ক্ষুব্ধ হ'ল। আর তাঁরাই বা কি হয়েছেন!

'আজ পুলিশের লোক এসেছিল খোঁজ-খবর নিতে। ও কার ছেলে, আমাদের কাছ থেকে চলে গেছে কেন, কতদিন গেছে, মাঝে এসেছিল কেন? অর্থাৎ তাদের 'কালো' খাতায় ওর নামের সঙ্গে আমাদের বংশ পরিচয়ও লেখা আছে। আর তার মানে এ বাড়ীর ছেলেদের ভবিষ্যৎ কাজকর্ম, সরকারী চাকরির দফা শেষ!' সতীশ তিক্তমুখে বল্লেন।

'চিরকাল ওর বাপ জ্বালিয়েছে সকলকে। এখন ও সবাইকে জ্বালাচ্ছে! গেছে যাক্, তা না বংশ পরিচয় দেওয়ার সাধটুকু আছে।' মেজকর্তা বল্লেন।

এতক্ষণে সুধীশের মুখে কথা এলো। সে বল্লে, 'পরিচয় নিশ্চয় সে নিজে থেকে দেয়নি।'

'না দেয়নি!' প্রবীর বল্লে। সে এসে দাঁড়িয়েছিল।

সুধীশ একটু চুপ করে থেকে বল্লে, 'তোমাদের বুঝি মনে হয় পুলিশের লোকেরা এতই ভাল মানুষ যে না বল্লে খোঁজ নিতেও জানে না!'

গিরীশবাবু বল্লেন, 'তা বটে কিন্তু ওর দুর্বুদ্ধির জন্য চিরকালের মত বাড়ীর উন্নতির পথে বাধা পড়ল।'

সুধীশ বাপের দিকে ফিরে বল্লে, 'তা হতে পারে। কিন্তু

নিজের মতে নিজে জেলে যাবার, কিছু করবার অধিকারও কি কোনো মানুষের নেই ?'

সতীশ বিরক্ত মুখে বল্লেন, 'না, নেই। নিজে ডুবে পাঁচ জনকে ডোবানোর অধিকার মানুষের নেই। উনি মহাত্মা হচ্ছেন, আমাদের ছেলেরা পথে বসবে, পুলিসী হ্যাঙ্গামে পড়বে ওঁর জন্য।'

সুধীশ বল্লে, 'তোমরা বল্লে না কেন, ওকে আমরা অনেকদিন বিদেয় করে দিয়েছি।'

সে নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিল কি করে সে এত কথা সকলের সামনে বলে যাচ্ছে এমনভাবে।

সতীশ অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বল্লেন, 'তোমার পরামর্শরই অপেক্ষা ছিল!'

তাঁর ছেলেরা বড় হচ্ছে। তাদের ভবিষ্যৎ কাজকর্ম কিছু বিদ্যার দ্বারা, কিছু সেলাম মুরুব্বি মারফৎ, খানিক বা উচ্চপদস্থ 'মহাজন'দের পরিচয় পত্র নিয়ে চাই, সবই কি ওই কাণ্ডজ্ঞান হীন গোঁয়ার ছেলেটার জন্য মাটী হবে।

সুধীশ আর কিছু না বলে বেরিয়ে আসছিল।

মেজকর্তা ডেকে বল্লেন, 'তুমি আর ওকে চিঠিপত্র লিখে সংস্রব রেখো না। তোমার চিঠিপত্রের সূত্র ধরেই পুলিশ এখানকার ঠিকানা পেয়েছে। সন্ধান নিতে এসেছিল। তিনি খুব ভালো দলে জুটেছেন, ভকৎ সিংদের দলে পাওয়া গেছে। যত সস্তায় নাম কেনার চেষ্টা।'

কাকার আহ্বানে সে ফিরে দাঁড়িয়েছিল, এবারে বেরিয়ে গেল।

সমস্ত বাড়ী ভরে গুঞ্জন ওঠে। ভীত ত্রস্ত যত না হোক বিরক্ত তিক্ত। ভয় ওঁদের বিশেষ নেই, সে ওঁরা জানেন। কিন্তু রাগ বিতৃষ্ণায় ভয়ের অসুবিধার যুক্তি দেখিয়ে নীতিশকে অপরাধী করার চেষ্টার শেষ ছিল না। যেন এতদিন পরে ওকে বঞ্চিত করার তবু একটা সপক্ষে যুক্তি পাওয়া গেল। আর অজানতেই সকলে খুব একটা মনে আরাম পেলেন।

রমারা দেশে নেই। বেলা দুঃখিত হয় যেন একটু। সুমিত্রা উর্মিলা কি ভাবে? আশ্বস্ত হয়? ভাবে কি? ভাগ্যে ওর সঙ্গে তাদের কারুর বিয়ে হয়নি! এই নিশ্চিন্ত নিশ্চিত সমৃদ্ধ জীবন-যাত্রা ফেলে কোথায় যেতে হ'ত কে জানে। তাদের গুরুজন ও তাঁদের নির্বাচনও কি এতদিন পরে তারা ঠিক মনে করে বাঁচে?

কিন্তু মেয়েদের অতল মনের কোথায় কি থাকে কে জানে তার কথা।

বড় বাড়ী, আপনার লোক, সম্ভ্রান্ততা, উচ্চাকাঙ্ক্ষার গতানুগতিক চিরন্তন বেড়া জালে জড়িয়ে সুধীশ আজো চুপি চুপি টাকা জমায়। লুকিয়ে লুকিয়ে নীতিশের খোঁজখবর নিয়ে জেনেছে, ঠিক ঠিক 'টেররিস্ট' দলে ওকে পাওয়া যায়নি। তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব মেলামেশা ছিল, সন্দেহ আছে।

এখন ছাড়া পাবে না। পনের হাজার বাংলাদেশের ছেলের মধ্যে সেও একজন, যারা নানা জেলে কখনো বক্সা, কখনো হিজলী, কখনো দেউলীতে থাকে, কখনো বা নিজগ্রামে নজরবন্দী হয়ে থাকে।

চিঠিপত্র সরকারী নিষেধ অনুসারে কাঁচি-কাটা হয়ে যায় এবং আসতে পারে। সুধীশ হাসপাতালের ঠিকানায় চিঠিপত্রও লেখে, খোঁজ-খবর নেবার ব্যবস্থা করে মাঝে মাঝে। ভরসা করে একদিন নিতুদা ছাড়া পাবে। তার কথা ভাবলে সেই নোংরা বিবর্ণ সতরঞ্চি জড়ানো বিছানা, চটা-ওঠা বাক্স-ওয়ালা, খাবারের পুঁটলী হাতে থার্ডক্লাসের যাত্রী নিতুদাকেই তার মনে পড়ে। আর কোনোদিনের কোনো ঘটনা তার অত প্রত্যক্ষ হয়ে মনে নেই। আর মনে পড়ে 'চাকরী পাইনি গো ভাই' কথাটি। সেই সঙ্গে মনে পড়ে যায় সেই বাবার মাসীমাকে। কাঁথা-জড়ানো বিছানা নিয়ে যিনি চলে গেলেন, আর আসেন নি। বাবার অনাথা মাসীমার সঙ্গে নিতুদার কি সাদৃশ্য তা' সে জানেনা, কিন্তু তার মনে হয়ে যায়।

এখন ১৯৩৫ সাল। টাকাও জমল কিছু। প্রায় দু'বছর বিদেশের খরচ একলার চলে যেতে পারে। কাঁচি-কাটা চিঠি কতকাল পরে পরে আসে। আর ভয়ে ভয়ে সেও বেশী লেখেনা, পাছে বাড়ীর সবাই জানতে পারেন! আর সে চিঠিতে না খবর, না মনের কোনো কথা পাওয়া যায়, ভালোও লাগে না।

তা হোক, একদিন সে ছাড়া পাবে। সেদিন তারা দুজনে একসঙ্গে যা' ইচ্ছে করবে, যেখানে ইচ্ছে যাবে। আমেরিকা, বিলেত, জাপান যদি নিতুদা যেতে মত করে। না যায় এদেশেই থাকবে, সেও যাবে না। সেও এই বাড়ীর মত নিজের কথা নিজের মধ্যেই রাখতে শিখেছে। সেই চমৎকার অভিজাত অহঙ্কার যার কথা নিতুদা লিখেছিল, সেই অহঙ্কার তাকেও কারুকে আপনার করতে দেয়নি। কিন্তু আর সকলের তো বন্ধু আছে, বধূ আছে, অন্য আপনার লোক আছে, তারাও কি তাদের কাছে নিজেদের কথা বলে না?

জানেনা সুধীশ। শুধু ভাবে, এমনভাবে মানুষ হ'ল তারা কেমন করে। কলের মত, যন্ত্রের মত। অহঙ্কারের বিরাট আড়াল থেকে তবু তার মনের কোন্‌খানে যেন ক্ষোভ জাগে। তারো নিচে কোন্ অতলে যেন চোখের জল ছলছল করে। যেন কারুকে চায় মন একান্তভাবে আপন করে। কে সে? নানা সম্পর্কের স্বজন? ভালো সম্বন্ধ করে বিয়ে-করা একটী সালঙ্কারা অভিজাত দুহিতা বধূ?—তার সঙ্গে কিছু ন্যাকামী, কিছু বাস্তব চিরকালের মত প্রেম ভালবাসার আলাপ!

সুধীশের হাসি পায়। আবার ভাবে তাহলে ভালোবাসার ক্ষমতাও তার—তাদের নেই? নইলে হাসি পায় কেন?

মন আবার গভীরভাবে ভাবতে বসে। মনে হয়, না, ভালবাসার ক্ষমতা নেই, ভালবাসাই নেই ওদের। আছে অভিজাত সম্পত্তিবোধ, সম্পত্তির তথা বংশধারা রক্ষার

আপ্রাণ চেষ্টা, আর তার অধিকারবোধ! যার একমাত্র লক্ষ্য নিরুদ্বেগ নির্বিঘ্ন ঔরংজেবীয় জীবন-যাত্রা। যার পথে কেউ বাধা হলে, কোনো বাধা এলে যেমনই সে আপনার জন হোক্ না, কেন সে বাধা সরাতে, চূর্ণ করে দিতে তার বাধে না। মনে মনে সকলেই কি ওরা ঔরংজেব? তফাৎ শুধু সম্রাট আর সাধারণ! যেমন? তার মনে পড়ে যায় নীতিশকে।

স্পষ্ট করে সেকথা কোনদিন সে ভাবতে পারে না। নিকটতম স্বজনের নির্মম লুব্ধ অবিচার-জড়ানো সে-কথা। অতি গোপন সঙ্গোপনে চুপি চুপি ভাবে। খাপছাড়া হয়ে মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের 'প্রবলের উদ্ধত অন্যায়' 'লোভীর নিষ্ঠুর লোভ!'...

সুধীশের টাকাও জমতে থাকে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, নীতিশও ছাড়া পায় না।

হাসপাতালে কাজ করতে করতে এলো পিয়ন। একটা প্যাকেট মত, আর একটা অদ্ভুত ধরণের চিঠি এসেছে।

চিঠিটা দেউলী থেকে এসেছে অনেকদিন পথে ঘুরে, ছোট বড় পুলিশ অফিস্ ঘুরে অনেক রকমের ছাপ গায়ে নিয়ে। খবরটি কয়েকটা কথা মাত্র সংক্ষেপে। রাজবন্দী নীতিশের কয়েক দিন হ'ল মৃত্যু হয়েছে। আর তার কয়েকটি চিঠি ও কাগজপত্র। সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে চিঠিখানা হাতে নিয়ে কতক্ষণ জানে না। সহসা ডাক পড়ে ডাক্তারের কর্তব্যে। কলের মত রোগীদের খাটের পাশে পাশে দাঁড়ায়। নার্সের

টুকে রাখা বিবরণী দেখে। জ্বর আঁকা-বাঁকা পথে উঠেছে নেমেছে কার,—কালাজ্বর একাজ্বরী, টাইফয়েড! হঠাৎ মনে হয়—নিতুদার কি হয়েছিল? পা যেন থেমে যায়, মনও। তবু কথা কয়, মন্তব্য লেখে, যা বলবার বলে। চলতে থাকে খাটের ধারে ধারে, রোগীর পাশে পাশে।

মন নিঃশব্দে চলে যায় কখন হাওড়া স্টেশনে, সেই কতদিন আগে আজমীর যাত্রী নীতিশের কাছে! বিছানা-বাক্স মাথায় করা কুলীর পিছনে তারা যাচ্ছে। চিরকালের পথে অনন্ত-কালের পথে চলেছে সেই যাত্রা। সে যাত্রা আজো থামেনি। অশ্রুহীন, শোকহীন—এক সুধীশ স্থির হয়ে এক মনে যেন দেখে সেই যাত্রা।

আবার ডাক পড়ে কাজের।

বাড়ী ফিরে আসে অনেক রাত্রে।

রাত্রি গভীর হতে থাকে, নিদ্রাহীন সুধীশ বসে থাকে প্যাকেটটা সামনে নিয়ে। কি আছে ওতে? কি কথা, কাকে লেখা?

অবশেষে খোলে। পুরাতন চিঠিপত্র, পরীক্ষা পাশের সার্টিফিকেটগুলি, তার লেখা চিঠিগুলি, একটা চিঠি আধখানা প্রতুলকে লেখা। তাকে লেখা একটুখানি। শেষ হয়নি। সব অর্দ্ধ সমাপ্ত। আর একটা চিঠি বীণাকে লেখা।

বীণা? কে বীণা? সুধীশ কি চেনে? চেনে না?

লেখা—"শ্রীমতী বীণা দেবী করকমলেষু,

অনেকদিন পরে ভাবি চিঠি লিখি আপনাকে কিন্তু কি বলে লিখি, মিস্ মুখার্জ্জি? না, বীণা দেবী? না, কি? কিছুই মনের মত সম্বোধন হয় না। আপনি বলি না, তুমি বলি তাও বুঝতে পারি না। চেনা আপনার সঙ্গে বেশী হয়নি, কয়েকদিনের মাত্র। হৃদ্যতাও হয়নি, অথচ মনে করতে গেলে আপনাকেই এখন মনে পড়ে কেন তা জানিনা। মনে হয়, যেন অনেক কথা বলবার আছে। আর তা বলা যায় আপনাকেই। কিন্তু চিঠি লিখতে বসে সে সব কথা আর মনে আসেনা। কি লিখি? কুশল প্রশ্ন? আপনার আমার তা নেই কিছুই। সম্পর্কও তা নয়। কুশল মঙ্গল প্রশ্নকে অতিক্রম করে যা' আছে সেই গভীর সম্পর্কও আমাদের নয় তবে কি বলতে চায় মন তাই ভাবি।

মনে হয়, শুধু সহজ ভাবে কথা কয়ে যাই। কোনো সমস্যা নয়, বিশ্লেষণ নয়, সুখ-দুঃখ বিচার নয়, সূর্য্যের আলোর মত নির্মল অনাবৃত অবাধ প্রকৃতির ঐশ্বর্য্যের মত অকৃপণ অগাধ সহজ পরিচয় আলাপে সে কথা হোক।

কিন্তু কথা কয়ে যাই, আসলে তাও নয়, আপনার কথা শুনে যাই, এইটেই আমার লোভ। দাণ্ডী যাবার পথে গাড়ীতে আমার সেই শোনা আরম্ভ হয়েছিল! কিন্তু শেষ তো হয়নি! শেষ কথার জন্য আর অবসর ছিল না। যাত্রা শেষ হয়ে গিয়েছিল সেদিন।

আপাততঃ কয়েকদিন ধরে জ্বরে পড়েছি, হাসপাতালে দিয়েছে, বড় ফাঁকা ঠেক্‌ছে, যেন কাকে কি বলতে ইচ্ছে করছে। তাই মনে হ'ল, আপনাকে লিখি একটা চিঠি। আবার ভাবছি আমার চিঠি পেয়ে 'বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা' পুলিসের হিসাবের খাতায় চিহ্নিত না হয়ে যান চিরকালের মত। সেটা কর্মক্ষেত্রে বড়ই অসুবিধাকর।

যাক্‌, শুধু লেখায় না হয় হোক, পাঠানোটা স্থগিত রাখব না হয়। আপনার কথা শোনা সেইটেই আসল লোভ বটে, কিন্তু হঠাৎ আমারো কিছু বলবার বিষয় এসে পড়েছে। তার শ্রোত্রী আপনিই হ'তে পারেন মনে হল।

কাল একটা স্বপ্ন দেখ্‌লাম। দেখলাম, কিষণগড়ের বালিভরা-মাঠে রৌদ্রে বেরিয়েছি। একলা। কোথায় যাচ্ছি জানিনা কিন্তু চলেছি! পথ মাঝে মাঝে আছে, মাঝে মাঝে নেই। যবের ক্ষেত, ভূট্টার ক্ষেত দূরে দেখতে পাচ্ছি। অদ্ভুত গরম। 'লু' চলছে। মাথায় রৌদ্র, পায়ের নীচে বালি গরম আগুন। দূরে দূরে ক্ষেত দেখতে পাচ্ছি বটে, কিন্তু কূয়ো একটাও দেখছি না। খুব তৃষ্ণা পেয়েছে, মানুষও নেই কেউ কোথাও। হঠাৎ দেখি কাছেই একটা কূয়ো রয়েছে। আর কুয়ো থেকে একটি ঘাগরা ওড়না পরা এ দেশী মেয়ে জল তুলছে।

কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। বল্লাম 'আমাকে একটু জল দেবে?' সে চমকে পিছন ফিরে চাইল, আর তার হাত থেকে মাটীর কলসীটা পড়ে ভেঙে গেল।

আমারো ঘুম ভেঙে গেল। আমার খাটের পাশে টুলের ওপর যে কুঁজোটা ছিল, সেটা ঘুমের ঘোরে আমার হাত লেগে পড়ে ভেঙে গেছে। আর সব রুগীরা জেগে উঠেছে। নার্স এসে দাঁড়াল।

কিন্তু জানেন কে সেই মেয়েটি? সে টুলু। টুলুকে বোধহয় আপনি চিনতেন। সুমিত্রাদের কাছে নাম শুনে থাকবেন। আপনাদের সঙ্গে স্কুলে পড়েছে। তাকেই স্বপ্ন দেখলাম।

জানেন না বোধহয় তার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা উঠেছিল। শেষে তার অন্য জায়গায় বিয়ে হ'ল।

তারপর একদিন কিষণগড়েই তার মৃত্যুর খবর পেলাম, বুলুর চিঠিতে। সেদিন অদ্ভুতভাবে দুঃখ পেলাম।

ভালবাসা কাকে বলে জানিনা, আর তা' যে ভাবেরই হোক পাইনি। কেউ করেছে রক্ষণাবেক্ষণ, কেউ করেছে নিরুপায় কর্ত্তব্য। ভালবাসতে শিখিওনি ছোট থেকে। ও জিনিষটা না পেলে লোকে প্রায় দিতেও শেখে না। আমরা শিখেছিলাম ভয় করতে, সঙ্কোচ সমীহ করে চলতে। বুলু টুলুও তাই শিখেছিল। টুলু বেশী করে, কেননা সে বাড়ীর কেউ নয়। যেন বেঁচে থাকাটাতেই তার অপ্রস্তুত সঙ্কোচের সীমা ছিল না।

কিন্তু সেদিনের দুঃখ, তার অকাল মৃত্যুর দুঃখ এ এক অদ্ভুত ক্ষোভভরা কষ্ট, এ আমাকে তাকে ভুলতে দেয় না।

যখনি মনে হয় কাঁটার মত মনে খচ খচ করে। করুণা নয়, তাকে করুণা করব এমন পদস্থ কিছু ছিলাম না বাড়ীতে, তার তুলনায় ; শ্রদ্ধা নয়, কেননা সে নিতান্তই নিরীহ মুখচোরা ছোট মেয়ে ছিল। মমতাও নয়, মোহও ছিল না। শুধু এক সঙ্গে এক বাড়ীতে মানুষ হয়েছিলাম মাত্র। তাতে মানুষকে যেমন মানুষ ভালবাসে। কিছুই জানিনা। শুধু বুঝতে পারি' এ যেন আমি তাকে ঘটনাচক্রে দুঃখ দিয়ে এসেছি, না জেনে তাই। যদিও সে দুঃখ পেয়েছিল কি না আমি জানিনা সেকথা কিছুই। তবু এই ক্ষোভ মুছে ফেলা যেত যদি সে বেঁচে থাকত, সুখে থাকত সকলের মত। ওরই কথা জানবার জন্য সেবারে কলকাতায় গিয়েছিলাম! কিন্তু কি কথা? কে বল্‌ত আমাকে? কিন্তু আজ আপনাকে একথা কেমন করে বলতে বসেছি—যদি এ চিঠি পাঠাতে পারি তাও ভাবি। আজ 'রাজদ্বারে' এসে অনেক মানুষকে দেখে বুঝতে পেরেছি, মানুষের দাম আছে মানুষ হিসেবেই। আত্মীয় নয়, উপকারী নয়, দরকারী নয়, শুধু সঙ্গী হিসেবে বন্ধু হিসেবেই তার দাম। এখানে এসে সকলেই সমান হয়ে গেছি। নানা শ্রেণী নানা স্তরের নানা শিক্ষার মানুষ আর তাদের ওপর নির্বিচার সরকারী 'বিচার'। সকলেই এক অবস্থায়, আপনার জনের মত সকলেই নিঃসঙ্কোচ। তাই যেন আজকে আমার সঙ্কোচ আর আপনার কাছেও নেই। আপনি মেয়ে বা অনাত্মীয় মেয়ে, সেকথা আজ জেলের পাঁচিল ভুলিয়ে দিয়েছে। এ

একটা মহা শিক্ষালয়! তাই অনায়াসে আপনাকে আজ আমার বন্ধু মনে হচ্ছে। আপনি যেন সেই বন্ধু যে, নির্ভয়, যে সত্য ছাড়া কারুকে ভয় করে না। যাকে পরম নির্ভয়ে সব কথা বলা যায়, তুচ্ছ বড় সুখ-দুঃখের সব কথা। সব যে পৃথিবীর মত ধারণ করে রাখতে পারে সহজেই।"

চিঠি এইখানেই থেমে গেছে। আর লিখতে পারেনি। অসুখ বেড়ে ছিল? অথবা আর কিছু লেখবার ছিল না? কিন্তু শেষ তো করেনি, কেননা নীচে নাম নেই।

সুধীশ অন্য কাগজ-পত্র নাড়ে চাড়ে। পড়তে ইচ্ছা হয় না। পরীক্ষা পাশের সার্টিফিকেটগুলোও কি তার সঙ্গে জেলেই ছিল? না বাক্সের মধ্যে ছিল পুলিসের হেপাজতে। আজ পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এই বীণা কে? জানলে এই চিঠিটা তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া যেত। হয়ত প্রতুলদা জানে।

স্তব্ধ হয়ে সে ভাবতে থাকে। এই মৃত্যু? এই অবশ্যম্ভাবী সত্য? যার পার নেই, কূল নেই, একেবারে চিরকালের পর্দা ফেলা নিস্তব্ধ নিষ্ঠুর মূক লোক।

রাত্রি গভীর হতে থাকে, বাড়ী নিস্তব্ধ হয়ে যায়। পথ নিস্তব্ধ হয়। সুধীশের চোখে জল আসতে চায়, কিন্তু আসে না। শুষ্কভাবে মনে হয় কেন? কেন সে সকলের মত কিছুদিনও বেঁচে রইল না? কত লোক তো থাকে। দুঃখ কষ্ট দারিদ্র্য অতিক্রম করে তারা বড় হয়ে ওঠে জগতে, মহৎ হয়ে ওঠে। কোনো মহৎ সম্ভাবনাও কি তার ভাগ্যে ছিলনা?

ভাগ্যও কি তার অমোঘ নিষ্ঠুর, তার স্বার্থপর নিষ্ঠুর স্বজনদের মত ?

ন্যায়-অন্যায়, বিচার অবিচার সে কাকে বলে তাহলে ? নেই সে সব ? না থাক্, কিন্তু সে নিজে ব্যক্তিত্বে, মহত্বে সার্থক হয়ে উঠ্‌ল না কেন ? সেই তো তার বিরাট জয় হ'ত।

রাত্রি শেষ হয়ে যায়। মন কঠিন হয়ে রাত্রি শেষের আকাশের দিকে নিদৃষ্টি নির্লিপ্ত ভাবে চেয়ে থাকে।

সারাদিন নানা কাজে কেটে যায়। বীণাকে লেখা নীতিশের চিঠির একটা লাইন মনে হয় বারে বারে তারি ফাঁকে ফাঁকে, 'এ মুছে ফেলা যেত যদি সে বেঁচে থাকত।' সেও মুছে ফেলতে পারত যদি নিতুদা বেঁচে থাকত। সব ভুলে যেত, হয়ত নিতুদাকেই ভুলে যেত! হয়ত যাবে ভুলে একদিন। তবু।

পরদিন সকাল বেলা খবরের কাগজের সঙ্গে দরোয়ান একটা চিঠি দিয়ে গেল চায়ের টেবিলে। চিঠির খামে গিরীশ-বাবুর নাম লেখা।

আশ্চর্যভাবে গিরীশবাবু চিঠি খুললেন।

চিঠিতে লেখা,

শ্রীচরণেষু বাবা, কাল পুলিশের চিঠিতে জানলাম নিতুদা দেউলী জেলে মারা গেছেন তিন সপ্তাহ হ'ল।

আমি ওখানকার হাসপাতালের কাজ ছেড়ে দিলাম।

আপনার সম্পত্তিতে যদি আমার কিছু অংশ থাকে তো

আপনি আপনার ইচ্ছামত দাদাদের বা যাকে ইচ্ছা দিয়ে দেবেন। ভবিষ্যতে কোনোদিনও আমি তাতে দাবী করব না।

আপনি আর মা আমার প্রণাম নেবেন।

ইতি প্রণত সুধীশ।

তিনি হতবুদ্ধির মত চিঠিটা আবার পড়লেন। ছোট চিঠি, পড়া শেষ হয়ে গেল তখনি। তাঁর মুখ কেমন বিবর্ণ হয়ে গেল।

সুমিত্রা চা ঢালছিল, জিজ্ঞাসা করলে, 'চিঠি কার বাবা, এত সকালে?' গিরীশ অস্পষ্টভাবে উত্তর দিলেন, 'চিঠি?' ছেলেরা এসে বসেছিল। তারা অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চাইল। সতীশ চিঠিটা হাতে করে তুলে নিলেন, মনীশও দেখলে। ভায়েরাও এসে বসেছিলেন। সতীশ বিরক্তভাবে কি একটা বলতে গেলেন। গিরীশ শান্তভাবে শুধু হাত নেড়ে বারণ করলেন। সকলে স্তব্ধ হয়ে গেল।

STATE CENTRAL LIBRARY W.B. Calcutta